নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্যঘন গল্প

পক্ষিরাজ

সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মিত্র

আষাঢ় '৮৮ জুলাই '৮১

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

— ঃ নিয়মিত পক্ষিরাজ পাবার নিয়ম ঃ—

এক বাংলা মাসের ৯ই তারিখে কাছের কোন বই স্টলে অথবা হুইলার্স এর স্টলে খোঁজ করলেই 'পক্ষিরাজ' পাওয়া যায়। দাম প্রতি সংখ্যা দু টাকা। শারদীয়-সংখ্যার দাম পৃথক।

দুই গ্রাহকরা ঘরে বসেই ডাক যোগে 'পক্ষিরাজ' পায়। এজন্য ডাক-মাশুল দিতে হয় না। ১২ মাসের গ্রাহক হলে ২৪ টাকা বৈশাখে গ্রাহক হলে ২২ টাকা (বৃহদাকার পূজা সংখ্যা সহ)। ৬ মাসের গ্রাহক হতে ১২ টাকা লাগবে। শারদীয় সংখ্যা রেজিস্ট্রি-ডাকে পাঠানোর জন্য বাড়তি ৩ টাকা দিতে হবে। হাতে নিলে লাগবে না। টাকা হাতে, মানি-অর্ডারে অথবা কলকাতার কোন ব্যাঙ্কের উপর ড্রাফট পাঠাতে হবে ('PAKSHIRAJ'—এই নামে ড্রাফট হবে।)

তিন যাঁরা গ্রাহক আছেন তাঁদের রিনিউ করার জন্য ২২ টাকা পাঠালেই চলবে। (২৪ টাকা নয়)।

চার নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশের সুযোগ আছে। 'লেখা' এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে। তোমাদের পাতায় লেখা, আঁকার জন্য গ্রাহক নং ও 'বয়স' উল্লেখ করতে হবে। নইলে নির্বাচনে অসুবিধা হয়। লেখা মনোনীত হল কিনা জানানো এবং অমনোনীত লেখা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কপি রেখে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

পাঁচ ধাঁধা, ভেবে ভেবে সমাধান প্রভৃতির উত্তর এবং একাধিক প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই পৃথক পৃথক কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। বিভাগীয় এবং যথাযথ প্রশ্ন ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ডাকে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে

ছয় ইস্কুল কলেজ ক্লাব লাইব্রেরী বুক-স্টল যে কোন প্রতিষ্ঠান ৩০ পয়সার ডাক টিকিট সহ লিখলে নমুনা কপি পাঠানো হবে।

—ঃ যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ—
৫৮বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৪৬

—ঃ বিক্রয় কেন্দ্র ঃ—
সাকসেস পাবলিশিং হাউস
১ বিধান সরণী
কলকাতা ৭৩

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা
নং ৫৫২/১ (১৩) টি. বি. সি.   তারিখ ২০/৫/৮০

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৮৮, জুলাই '৮১

ছোটদের মনের মতন অভিনব মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

দাম : এক টাকা

চিত্রে গল্প :	ময়দানবের দ্বীপ/প্রেমেন্দ্র মিত্র	১০
	বিষাক্ত তীর/নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১
	চুনোপুঁটি/দিলীপ দাস	২৯
ছড়া ও কবিতা :	দাদু এখন বন্দী/অন্নদাশংকর রায়	৫
	যদি/সরল দে	২০
বিশেষ রচনা :	সংবাদ-বিচিত্রা/বিশ্বামিত্র	১২
	বিশ্বরেকর্ড/উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১২
	ডাকটিকিটে গ্রহান্তর/কমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
বিশেষ বিভাগ :	আঁকি বুকির খেয়াল খাতা	৪
	তোমার প্রিয় আমার প্রিয়	২৩
ধারাবাহিক উপন্যাস :	সবুজ পাতা লাল ধুলো/নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৭
গল্প :	বুমবাইর চিঠি/অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
	শাস্তি/মুস্তাফা নাশাদ	১৮
কার্টুন :	পিকলু/পরিচয় গুপ্ত	২২
ম্যাজিক :	এস ম্যাজিক শেখাই/পি. সি. সরকার জুনিয়র	২১
ধাঁধা :	ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর	২৮
প্রতিযোগিতা :	সুব্রত সাহিত্য প্রতিযোগিতার ছড়া ও ফলাফল	৬/২৮
	ভেবে ভেবে সমাধান ও উত্তর	৩০
	বলো তো ?	৩৪
খেলা :	ছেলেবেলার গল্প/শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
	যোগাসন/যোগী	২৬
হাতের কাজ :	পদ্মফুল/মঞ্জুদি	৩১
তোমাদের পাতা :	আগামীকালের লেখকদের আসর	৩২

অলংকরণ : **দেবাশিস দেব**

বিক্রয় কেন্দ্র : সাক্সেস্ পাবলিশিং হাউস, ১ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭৩

বিমান মাশুল ॥ ত্রিপুরা ১৫, পয়সা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সোকা পিলজা-র

আঁকি বুকির খেয়াল খাতা

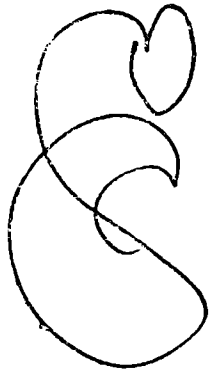

করে যদি বায়না,
যাবেই সে গায়না,
ধরে এক আয়না
ম্যাপ খুলে সামনে
গায়না দেখাও তাকে
একটা না তিনটে— ।
যেতে গেলে কাঁড় লাগে
দেখে নিতে হয় আগে
ছাপা কোন সরকারী 'মিন্ট'-এ ।

ডান দিকের ছড়াটি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কয়েকটা জায়গায় ভুল ছাপা হয়েছিল। তাই শুদ্ধ করে এসংখ্যায় পুণরায় প্রকাশিত হল।

—সম্পাদক

থাকুক কিংবা নাইবা থাকুক পয়সা
ঘৃত খেলে, গব্য খাবে,
কখখনো নয় ভয়সা

কিন্তু জেনো বস্তুবাদী চর্বাক
মোটেই তেমন নয়ক [illegible]
যতটা তাঁর নাম [illegible]

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
[illegible] উত্তীর্ণ
হয়ত কোথাও ধরবে [illegible]
তোমার একটি কর্ণ

তাই বলে কি ছাড়বে ঘৃত
হয় যদি তা গব্য ?
কখখনো না। পড়ে দেখো
ন্যায়শাস্ত্র নব্য। *

দাদু এখন বন্দী

অন্নদাশঙ্কর রায়

ধন্যি ওদের রাস্তা খোঁড়া !
দিদুকে প্রায় করলে খোঁড়া
পা পড়ে না মাটিতে
ট্যাক্‌সি ডাকো, শুনবে নাকো
রাত দশটায় দাঁড়িয়ে থাকো
পারবে নাকো হাঁটিতে।

পথের ধারে আমরা দু'জন
দেখতে পেলেন পথিক সুজন
আনতে গেলেন ট্যাক্‌সি
রাজী হলেন রাজা, তবে
ভাড়ার উপর দিতে হবে
তিনটি টাকা ট্যাক্‌স-ই !

ডাক্তারে কয়, মচকে গেছে
হাড় ভাঙেনি, চোট লেগেছে
আস্তে আস্তে সারবে।
বন্ধ এখন নড়ন চড়ন
হপ্তা কয়েক বাঁধা চরণ
চলতে পরে পারবে।

সেরে উঠেই হুকুম জারী—
"রাস্তা হাঁটায় বিপদ ভারি
তুমিও হবে ল্যাংড়া।"
দাদু হলেন নজরবন্দী
খাটবে নাকো ফিকির ফন্দী।
হাসছিস্ যে, চ্যাংড়া?

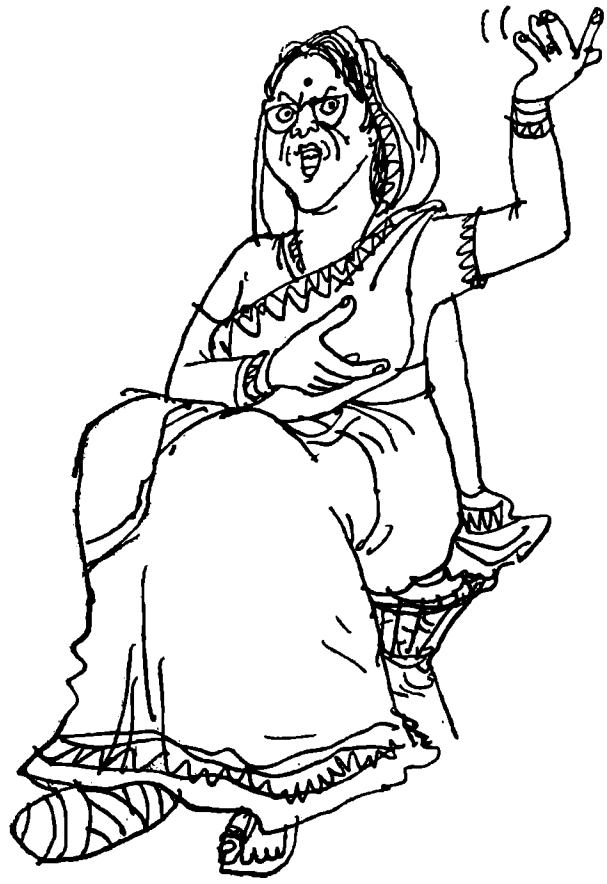

॥ সুব্রত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

দুষ্টু

তথাগত মজুমদার

হলদে কালোয় ডোরা ডোরা
বাঘ ঘুরছে জোড়া জোড়া,
কোথায় সে বাঘ ?
সোঁদরবনে ।

কেমন সে বাঘ ?
অলুক্ষনে ।
ঐ চলেছে সেজেগুজে
কিন্তু বেজায় দুষ্টু সে যে ।

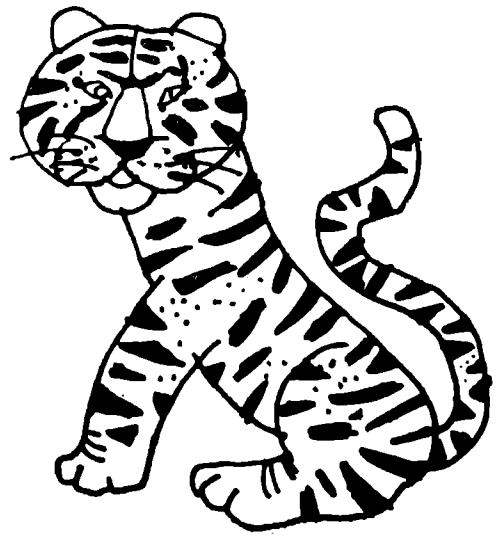

॥ সুব্রত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

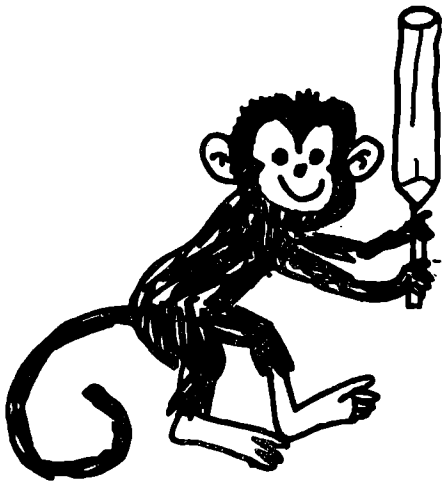

হঠাৎ

অনির্বাণ চৌধুরী

এক যে ছিল শিম্পাঞ্জি
খেলত দারুণ ক্রিকেট ।
দুম করে সে বসল কেটে
মক্কা যাবার টিকেট ॥

মক্কা গিয়ে অক্কা পেলো
তার ধম্মো বাবা
হলো না আর ঘুরে দেখা
তাব্রিজ আর কাবা ॥

।। পনের ।।

লাখন সিং যে ঐ ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে আছে তুমি জানলে কি করে ?

জানি হুজুর, আমি জানি।

কি রকম চেহারা লোকটার—দেখতে কি রকম ?

তাকে দেখলে আদৌ ডাকাত বলে মনে হবে না। লোকটা যে খুব সহজে হাসতে হাসতে কারো জান নিয়ে নিতে পারে লোকটাকে দেখলে ভাবতেই পারবেন না হুজুর।

বিভূতি সেন যেন কি ভাবলো—তারপর বললে, ফটো দেখলে তাকে সনাক্ত করতে পারবে—

কেন পারবো না, খুব পারবো—

বিভূতি সেন সার্জেন্ট বকসীকে কি বললো—বকসী একটা এ্যলবাম নিয়ে এলো। সে এ্যলবামের মধ্যে কিছু পলাতক দুর্ধষ ডাকু ও খুনীর ফটো ছিল—তার মধ্যে সিংজীরও ফটো ছিল। সেই ফটোটা বের করে বিভূতি সেন বললে, মাধো সিং—দেখত—একে তুমি কখনো দেখেছো—

কেন দেখবো না দেখেছি—

কোথায় দেখেছো—ঐ ফিয়ার্স লেনের বাড়িতে ?

জী হাঁ—

চেনো তাহলে একে ?

চিনি।

এর নাম কি জান ?

এরত একটা নাম নয় হুজুর—দুটো তিনটে নাম ওর—

দুটো তিনটে নাম—

জী হাঁ !

কি নাম বলতো ?

জগমোহন, প্রীতম সিং, হীরা সিং—

বিভূতি সেনও একেবারে বোবা লোকটার কথা শুনে।

বিরূপাক্ষ বললে, এর আর কোন নাম নেই ?

হ্যাঁ—আছে—তবে সে কথা কেউ জানে না।

কি নাম বলতো ?

মাপ করবেন হুজুর—সে আমি বলতে পারবো না।

বলতে পারবে না। কেন ?

ও তাহলে আমার ঠিক জান নিয়ে নেবে।

না, না—

আপনি জানেন না হুজুর, ও পারে না এ দুনিয়ায় এমন

কোন কাজ নেই, ও যদি একবার মনে করে আমার জান নিয়ে নেবে ত ঠিক নিয়ে নেবে। আমি কোন সাততলা বাড়ির ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও নিয়ে নেবে। ক্ষমা করবেন হুজুর ওর আসল নামটা আমি বলতে পারবো না।

হুঁ। তা তুমি কি বলতে এসেছিলে। বিভূতি সেন বললে।

যা আমার বলবার বিভূতি ইনেসপেকটার সাহেবকেই বলবো।

আমিই বিভূতি সেন—

আপনি,—আপনি ইনেসপেকটার—

লোকটা যেন কেমন এক দৃষ্টিতে তাকাল বিভূতি সেনের দিকে। লোকটার দুচোখে যেন হিংস্র হায়নার দৃষ্টি। তারপরই

হঠাৎ যেন চোখের পলকে ব্যাপারটা ঘটে গেল।

প্রচন্ড একটা শব্দ—অজস্র ধোঁয়া—

সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়—

একটা চেঁচামেঁচি—ঠেলা ঠেলি।

পাকড়ো—ক্যাচ হিম—এ্যারেস্ট হিম—

ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল—বিভূতি সেন—ডান হাতের কাঁধের কাছে প্রচন্ড চোট পেয়েছে—বাঁ হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে আছে—আঙ্গুলের ফাঁকে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা।

মুখে যন্ত্রনার চিহ্ন।

ঘরের মধ্যে সার্জেন্ট শিকদার—বিভূতি সেন ছাড়া আর কেউ নেই—মাধো সিং ও বিরূপাক্ষ সেনও নেই।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা পুলিশ হাসপাতালে একটা বেডে শুয়ে আছে বিভূতি সেন। তার কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা। একটা লোহার সিপ্লনটার ঢুকেছিল কাঁধের সামনে সেটা অপারেশন করে বের করা হয়েছে—

সামনে বসে বিরূপাক্ষ।

তাহলে লোকটাকে ধরতে পারলেন না মিঃ সেন।

বিরূপাক্ষ বললে না—

হঠাৎ যে অমন একটা কাজ ঘটবে সত্যি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি বিরূপাক্ষ বাবু। বিভূতি বললে।

ভাবতে পারিনি আমিও—নচেৎ বিরূপাক্ষ সেনকে বোকা বনতে হতো না।

এখন দেখতে পাচ্ছি বিরূপাক্ষ বাবু—সে রাত্রে ফিয়ার্স লেনের বাড়িটা রেইড করে মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে—

সে রাত্রে-ঐ বাড়িটা রেইড না করলে—এই সংবাদও তুমি পেতে না বিভূতি। যাক সে কথা—আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল।

না।

সুনন্দর কোন সংবাদ পেলো তোমার লোকেরা।

না। এখনো কোন সংবাদই সুনন্দর পাওয়া যায় নি। তার বস্তির বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে—সেখানেও সে যায় নি।

সুনন্দর মার সঙ্গে দেখা করেছিল তোমার লোকেরা।

ভদ্রমহিলা বেশীর ভাগ সময়—হাসপাতালেই থাকেন—শুনলাম তার দাদুর অপারেশন ভাল হলেও এখনো বেশ কিছুদিন লাগবে সুস্থ হতে—তবে একটা সংবাদ আছে—

কি সংবাদ।

সুনন্দও দাদুর দামী দামী ঔষধ পত্র ও আহার্য—কোন কিছুর যাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য কে এক ভদ্রলোক যা টাকা লাগবে দেবেন বলেছেন—হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে।

বিরূপাক্ষ বললে, কে সে ভদ্রলোক—

তার নাম কি ?

সেইটাই জানা যায়নি বিভূতি সেন বললে !

জানা যায়নি মানে কি !

মানে ভদ্রলোক তার নামধাম কিচ্ছু জানানি। হাসপাতালে কেবল বলেছেন তিনি সুনন্দর একজন হিতাকাঙ্খী। তাছাড়া যে ভদ্রলোক হাসপাতালে টাকা দিতে এসেছিল সেও বলেনি দাতার নাম ধাম কি ?

বিরূপাক্ষ বললে, ক্রমশঃই সমস্ত ব্যাপারটা যেন কি রকম একটা রহস্যের মধ্যে জটিল হয়ে উঠছে।

বিভূতি সেন বললে, তাইত দেখছি—আচ্ছা বিরূপাক্ষ-বাবু আপনি সুনন্দর বিপদের কথা কি করে জানতে পেরেছিলেন।

সেও এক বিচিত্র ব্যাপার—

কি রকম ?

এক ভদ্রলোক টেলিফোন করে সুনন্দর বিপদের কথা আমাকে জানিয়েছিলেন, নামধাম কিছু বলেননি। আজও সকালে আমাকে ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ—সুনন্দর কোন খোঁজ পাওয়া গেল কিনা জানবার জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি হলো সুনন্দর !

সিংজী সে রাত্রে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পরও সুনন্দ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

বাইরে থেকে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ আসছে থেকে থেকে।

সুনন্দ কি করে বুঝতে পারে না।

ঐ সময় লতা এসে ঘরে ঢুকল।

কে ?

আমি লতা।

লতা, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে।

আমি আমার বাবাকে খুঁজছিলাম।

পেয়েছো তোমার বাবার খোঁজ—

না। কিন্তু তুমি আর এখানে থেকো না। চলো তোমাকে গলির দরজা দিয়ে বের করে দিই—

বাড়িটার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে পুলিশ—এখন আর এবাড়ি থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই লতা।

ঠিক আছে আমার আরো একটা পথ জানা আছে—চলো।

চলো—

দু'জনে ঘর থেকে বেরুল।

চলে এলো সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার ছাতে।

সেখান থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নীচ পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। সিঁড়িটা দেখিয়ে লতা বললে, এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও—বাড়ির পিছনে একটি সরু গলি মত আছে—এটা অনেক দিন আগে ম্যাথরদের যাতায়াতের পথ ছিল। আমার বাবা সিঁড়িটা একদিন আমাকে দেখিয়েছিল—এই সিঁড়ি দিয়ে তুমি নীচে নেমে যাও—তারপর গলি দিয়ে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু তুমি—তুমি যাবে না লতা ?

না। বাবাকে ফেলে আমি কোথায়ও যাবো না। এই নাও টর্চটা—নীচে বড় অন্ধকার।

সুনন্দ আর কিছু বলল না। টর্চটা হাতে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল নীচে। অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার নীচে। সুনন্দর টর্চ জ্বালতে সাহস হয় না। অন্ধকারেই নামতে থাকে নীচে।

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃতির কলকাতা

কলকাতার ভিড় থেকে একখামচা মানুষ তুলে নিলেই সারা ভারতের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে।

কথাটা কিছু অতিরঞ্জন হলেও সত্যি। ভারতের সমস্ত রাজ্যের মানুষই এখানে মিলেমিশে একাকার। কলকাতার 'আত্মা' খুঁজতে হলে কিন্তু এই সর্বধর্ম, সর্বজাতের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথাটাই ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

কলকাতার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা গর্ব করি সেটা হলো মানুষকে মানুষ হিসেবে অর্থাৎ সমস্ত জাতপাতের ঊর্ধে স্থান দেওয়ার বিশেষত্ব।

আরও বিশেষত্ব আছে—কলকাতা সব সময় অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত। এখানকার ইতিহাসের শিক্ষাই হচ্ছে সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সেইজন্য কলকাতা সব কিছু গ্রহণ করছে উদারভাবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করছে যা কিছু নিকৃষ্ট এবং যা কিছু অরুচিকর।

অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে সুস্থ সংস্কৃতির এবং চিন্তাধারার ওপর আঘাত সব সময়ই আসছে। তার প্রভাবও সমাজ জীবনে কিছুটা পড়ছে। এখন আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যাতে কলকাতা তার বৈশিষ্ট্য না হারায়।

তোমাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব এবং বিশেষ ভরসা। কারণ তোমরাই তো কলকাতার ভবিষ্যত নাগরিক কোনও সময়েই যেন কেউ সংকীর্ণতার শিকার না হয়, এটাই চাইছি।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

ময়দানবের দ্বীপ

বিজয় দেখতে পেল
যাঃ, আলোটা নিভে গেল!
বিরাট দেহ, কিন্তু যেন কঙ্কাল। এত ভুল দেখলাম?
তখন এদিকে অমিত
একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।
বিজয় অন্ধকারে সন্তর্পণে কেবিনটার দিকে এগিয়ে যায়

কাহিনী · প্রেমেন্দ্র মিত্র ছবি · দিলীপ দাস

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বামিত্র

সম্প্রতি কালীঘাট সত্যচরণ ইনস্‌টিটিউটের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা ও নদীয়ার মোট ৯৭ জন প্রতিযোগীর মধ্যে চারটি বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হয়েছে ডোরা সাহা, ডিউক চক্রবর্তী, রেবেকা চক্রবর্তী এবং চিন্ময় ভট্টাচার্য। সুধীর মিত্র, শুদ্ধস্বত্ব বসু প্রমুখ বিচারকের আসনে ছিলেন।

* * * *

ইনডিয়ান ইনস্‌টিটিউট অব অ্যাসট্রোফিজিকসের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, ইউরেনাস গ্রহের চারিদিকেও শনিগ্রহের মত বলয় আছে। ইউরেনাস গ্রহ তার গতিপথে একটি তারার ওপর ছায়া ফেললে তার বলয়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা কাভালুরে দুটি টেলিসকোপের মাধ্যমে এই দৃশ্য দেখেন।

* * * *

অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আরটসে চিত্রমেলার উদ্যোগে গত ৭—১৩ এপ্রিল চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে ১৯ জন ছাত্রছাত্রীর মোট ১০১ টি ছবি স্থান পেয়েছে। চিত্র-শিল্পীদের বয়স ৭ থেকে ১৪-র মধ্যে। প্রদর্শনীর ছবি দেখে শিল্পীদের বয়স অনুমান করা কঠিন। বেশ কয়েকটি ছবি ভাবনায় এবং রঙের ব্যবহারে যথেষ্ট পরিণত। বিশেষ করে রুনা রক্ষিত (৬)-এর 'পাখি'; অয়ন চক্রবর্তী (৭)-র 'মাছ'; বন্দনা মেহেতা (৬)-র 'ফুল'; দিপালী ভোরা (৭)-র 'হাতীর সঙ্গে ক্লাউন'; বিকাশ জৈন (৮)-এর 'ল্যানডস্কেপ' অরুন নারায়ন (৮)-এর 'সান ফ্ল্যাওয়ার'; শৈবাল দত্ত (১০)-র 'ধর্মতলা স্ট্রীট'। চিত্রমেলার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। ধন্যবাদ প্রশিক্ষকদের। চিত্রমেলা ছোটদের আঁকা শেখার স্কুল —৮/সি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৬।

* * * *

মালদহ জেলার 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় '৭৯-'৮০ সালের জন্য প্রাইমারী বিভাগ থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে গোবিন্দপুর বিদ্যালয়ের (খবরা সার্কেলের অন্তর্গত) চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মঞ্জু আরা খাতুন। মঞ্জু গতবারে ৩য় পুরস্কার পেয়েছিল।

* *

উত্তর কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা দর্শমিকা তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান ১৯শে জুন শ্যামবাজার বাসুদেব মঞ্চে করছেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকছে সংস্থার সভ্যগণ অভিনীত নাটক মনোজ মিত্রের 'পাহাড়ী বিছে' ও পি. সি. ইউ. কর্তৃক প্রাদেশিক লোকনৃত্য।

বিশ্বরেকর্ড

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সবচেয়ে দামী কলম জোড়ার দাম ৯,৯৪১ পাউন্ড; বানিয়েছেন আলফ্রেড ডানহিল লিমিটেড নামে বিলেতের এক কোম্পানী। ১৮ ক্যারাট সোনায় তৈরি একটি কলমের নিব ফাইবার গ্লাসে বানানো, অন্য বল পয়েন্ট কলমটির মুখে সাড়ে তিন ক্যারাট ওজনের একটি হীরে বসানো। ঐ কলম জোড়া এখনও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

মিঙ্কের লোমে মোড়া, সোনার বকলশ লাগানো এক জোড়া চুনী বসানো গল্‌ফ খেলার জুতো বিলেতের স্টাইলো ম্যাসমেকার্স ইণ্টারন্যাশানাল লিমিটেডের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। দম পড়ে ২,০০০ পাউন্ড। মানে কম পক্ষে ৪০,০০০ টাকার মত। ঐ জুতোরও খদ্দের জোটে মাঝে মধ্যে।

পৃথিবীর গভীরতম (১২,৬০০ ফিট অথবা ২·৩৮ মাইল) হীরক খনি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার কার্লেটন ভিলে। খনির নাম—ওয়েষ্টার্ণ ডীপ্ লেভেলস্ মাইন। ১৯৭৫ সালে খুঁড়তে খুঁড়তে শ্রমিকেরা ঐ গভীরতায় পৌঁছায়। খনি-গর্ভের তখন তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ১৩১° ফারেনহাইট। ঐ তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে খনির ভেতরে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোনার খনিগুলি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্‌সবার্গ শহরের ৩০ মাইল পূর্বে ও পশ্চিমের শহরতলীতে। ঐ সোনার খনিগুলি ১৮৮৬ সালে জর্জ হ্যারিসন প্রথম আবিস্কার করেন। ঐ খনি এলাকার নাম 'উইট ওয়াটার স্ট্রান্ড গোল্ড ফিল্ড।' বর্তমানে পৃথিবীর মোট প্রাপ্ত স্বর্ণের ৪৫ ভাগ ঐ সব খনি থেকে পাওয়া যায়। প্রায় ৩ লক্ষ বান্টু শ্রমিক ৪৪ হাজার শ্বেতাঙ্গ ঐ খনির কাজে নিযুক্ত। ১৯৭৫ সালে রেকর্ড উৎপাদন হয়। বিশ্বের মোট স্বর্ণ উৎপাদনের ৭৪ ভাগ বা ১১০০২ টনের মত।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবরটি জাপানের ওসাকা শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। সম্রাট নিন্টকু ৪২৮ সালে মারা গেলে সেই কবরটি গড়া হয়। ওটি দৈর্ঘে ১,৫৯৪ ফিট, প্রস্থে ১০০০ ফিট, উচ্চতায় ১৬০ ফিট।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গম্বুজটির বেড় ৬৮০ ফিট; ঐ বিশাল গম্বুজটি রয়েছে মার্কিন দেশের নিউ অরলিয়ন্স শহরে। নাম লুইসিয়ানা সুপার ডোম। প্রাচীন রোমের প্যানথিয়ন প্রাসাদের গম্বুজটিও বিশাল; তার বেড় ১৪২ ফুটেরও বেশি। মার্বেল গড়া ঐ গম্বুজ নির্মিত হয় ১১২ খ্রীষ্টাব্দে।

ডাকটিকিটে গ্রহান্তর

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত রকমের ডাকটিকিট ছাপা হচ্ছে। ছোট ছোট দেশ যাদের চাঁদে অভিযান চালানোর মত ক্ষমতাও নেই, তাদের ডাকটিকিটে চন্দ্রাভিযানের ছবি ছাপা হচ্ছে। সব দেশের নজর ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের দিকে। ডাকটিকিট ছাপলে সমগ্র পৃথিবীর সংগ্রাহকদের তা বিক্রি করা যাবে। ডাকঘরে টিকিট ব্যবহারের জন্যে দেশের মানুষ আর কত কিনবে? সব দেশের নজরই থাকে বিশ্বের ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের দিকে। আজকাল ডাকটিকিট যোগাড় করার বাতিক সব দেশেই খুব বেশী চালু হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেই কারণে ছোট ছোট দেশগুলোও রঙচঙে বড় আকারের ডাকটিকিট ছাপিয়ে চলেছে। আজকাল সংগ্রাহকদের মধ্যে বিষয় বা থীম্ অনুসারে ডাকটিকিট যোগাড় করা খুব চালু হয়েছে। আর বিষয়ই কি কম? কেউ খেলাধুলোর বা ওলিম্পিকের ডাকটিকিট যোগাড় করছে, কেউ করছে ফুল, পাখী, জন্তু জানোয়ার, মাছ বা প্রজাপতির ডাকটিকিট। তা ছাড়া থীমাটিক বা বিষয় অনুসারে ডাকটিকিট যোগাড়ে পয়সা খরচও কম হয়।

আর বিষয়েরই কি শেষ আছে? রুশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, পোলান্ড প্রভৃতি দেশে প্রতি মাসে যত নতুন টিকিট বেরুচ্ছে, তা থেকে বিষয় ধরে টিকিট জমানোর সুবিধে অনেক। গত ফেব্রুয়ারী মাসে হাঙ্গারী সাতখানি ডাকটিকিট বের করেছে। বিষয়ের নাম দিয়েছে বিজ্ঞানের কাহিনী। এই ডাকটিকিটে আছে গ্রহান্তরে মানুষের অভিযানের নানান কল্পিত কাহিনী। আর্টিস্ট ছবি এঁকেছেন নিজের কল্পনামত, আর সেই রঙীন ছবিগুলির প্রতিলিপি ডাকটিকিটে ছাপানো হয়েছে।

মানুষ চাঁদে নেমেছে কয়েক বছর আগে। ডাকটিকিটে ছবি দেওয়া হয়েছে চাঁদের ষ্টেশনের, ভবিষ্যতে যে ষ্টেশন থেকে পৃথিবীতে মানুষের যাতায়াত চলবে। ষাট-কিলারের ডাকটিকিটে চন্দ্রে উপনিবেশ কেমন হবে তার ছবি দেওয়া হয়েছে। সবই কল্পনার ব্যাপার। মানুষ গ্রহান্তরে যে অভিযান চালাচ্ছে তাই নিয়ে চিত্রকর ছবি এঁকেছেন আর হাঙ্গারীর ডাক বিভাগ ডাকটিকিটে সেই সব ছবি ছাপিয়ে ভবিষ্যতে কি হতে পারে তাই দেখিয়েছেন। চাঁদে মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করছে, এমন বৈজ্ঞানিক কাহিনী নিয়ে বই লেখা হচ্ছিল, এখন ডাকটিকিটও বেরুচ্ছে।

দু' ফেয়ারিস্টের ডাকটিকিটে দেখানো হয়েছে, পৃথিবী থেকে নতুন ধরণের নভোযান নক্ষত্রলোকে পাঠানো হয়েছে নক্ষত্রলোকে অনুসন্ধান চালাতে। নতুন ধরণের সেই নভোযান দেখতে গোলাকার। আর এক ডাকটিকিটে মঙ্গল গ্রহের মহাকর্ষনের বিষয় দেখানো হয়েছে। শনিগ্রহ বা বৃহস্পতি গ্রহেও ভবিষ্যতে মানুষ কী ধরণের নভোযান পাঠাবে চিত্রকর তারও ছবি দিয়েছেন। ডাকটিকিটে গ্রহান্তরের ও নভ-অভিযানের এমন কাল্পনিক ছবি কমই দেখা যায়।

নতুন খবর!

বলতে পার সেটা কী? হয়ত ভেবে কূল পাচ্ছ না। তাহলে শোনই বলি।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হচ্ছে মাসিক গল্প প্রতিযোগিতা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের মাস শ্রাবণ—এই শ্রাবণ থেকেই আমাদের এই প্রতিযোগিতা শুরু করার ইচ্ছে।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতা যেমন নামে হয় গল্প প্রতিযোগিতাও তেমন নামে হবে। গল্প প্রতিযোগিতার আসরে তোমরা যারা ছবি ছাপতে চাও, এক কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো সহ ২৫ টাকা এখনি দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। চিঠিতে বা ছবির পিছনে **গল্প প্রতিযোগিতার জন্য** কথাটি লিখতে ভুলো না। যারা আগে পাঠাবে, তারাই অগ্রাধিকার পাবে।

গল্প পাঠানোর নিয়মাবলী আগামী সংখ্যায় ঘোষণা করা হবে।

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতা !!

শ্যামল সেন, ৮৫/এফ আলিপুর রোড, কলকাতা ২৭ পক্ষিরাজ মাসিক আহূত ছড়া প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। আষাঢ় মাসের ছড়া প্রতিযোগিতার নামকরণ হল—**শ্যামল সাহিত্য প্রতিযোগিতা।**

প্রথম পুরস্কার ঃ ১০ টাঃ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৫ টাঃ

ছড়ার কোনও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। যে কোনও বিষয়ের ওপরেই লেখা যেতে পারে। তবে মৌলিক ও ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রতিযোগী একটি ছড়াই পাঠাতে পারবে। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর '**শ্যামল** সাহিত্য প্রতিযোগিতা' কথাটি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছড়া দুটি রচয়িতার নামসহ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে এবং পুরস্কারের টাকা M. O. যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছড়া পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই '৮১।

বিঃ দ্রঃ—পক্ষিরাজের পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে যে কেউ এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারেন। অর্থাৎ কেউ ১৫·০০ টাকা (**প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা**) সহ এক কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো (অবশ্যই গ্লসিতে ছাপা) পত্রিকা অফিসে পাঠালে, অনুরূপভাবেই আমরা পরবর্তী কোনও মাসে সেই ছবি প্রকাশ করব এবং সেই নামে সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করব।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যারা আগে ছবিসহ টাকা পাঠাবেন, তারাই এতে অগ্রাধিকার পাবেন।

বুমবাইর চিঠি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুমবাইর মনটা ভাল নেই। অমল জেঠু রাগ করে চলে গেছে। যাবার সময় জেঠু তার সঙ্গে একটা কথা বলেনি। বুমবাইর যত রাগ এখন মার উপর। মা টা কেমন নিষ্ঠুর। সে বাবাকে খুব ভালবাসে। তার পড়াশুনা নিয়ে বাবার কোন হাঁক ডাক নেই। কেবল একটা কথাই বাবা বলে, তুমি কিন্তু অমল জেঠুর মতো বড় হবে। তারপর সহসা জেঠুর উপরই রাগটা গিয়ে তার পড়ল। কেন আসা। দেখছ মা পছন্দ করে না, তুমি এলে আড়ালে মা মুখ ভার করে থাকে—তোমার সামনে মার মুখখানা দেখলে কে বলবে, বিছানায় বাবার সঙ্গে সারারাত গজ গজ করেছে—মানুষটার কোন কান্ডজ্ঞান নেই। ঠিক বুমবাইর পরীক্ষার আগে হাজির হবে। আর রাজ্যের যত গল্প, কি খেত, কোথায় যেত, মুড়াপাড়ার হাতী, মেঘনার উত্তাল বর্ষা, কাচকি মাছ, সোনালী ঢাইন—বুমবাইর পরীক্ষাটা প্রতিবার এসে মাটি করে দেয়। আর গাদা গাদা সব বাজার—কে করে। বল কে করে।

বাবা আর না পেরে বলেছিল, এবারে রাঙ্গাদা এলে বলে দেব, তুমি একজন চাকর বাকর সঙ্গে নিয়ে এস। দেশের খাওয়া রান্না করে খাওয়ানো তোমার বৌমার কম্মো নয়। এখন সখ টখ বলে আমাদের কিছু থাকতে নেই। সব রেডিমেড চাই। তিলের অম্বল, লাই পাতা দিয়ে শুকতোনি, ভাড়ালির পুড় কে করে খাওয়াবে। একি আমাদের মা মামীদের সংসার।

বুমবাই ঘাপটি মেরে শুনছিল। জেঠুকে ছোট করতে তার বড় লাগে। জেঠু তাকে নিয়ে বিকেলে বের হয়ে যেত। অদ্ভুত জেঠুর স্বভাব। বুমবাই এটা কি মাছ বলত? এটা কি পাখি বলত? এটা কি ঋতু বলত? এই ঋতুতে কি সবজি হয় বলত? কখনও জেঠু সামনের একটা টিলায় দাঁড়িয়ে বলত, হেঁটে যেতে পারবি আমার সঙ্গে। মাঠ পার হয়ে চলে যাব। সে অবাক হত। টিলাটায় দাঁড়ালে যে পৃথিবী দেখা যায়—ততদূরে সে কোনদিন যায়নি। সে পুরী গেছে, দার্জিলিং গেছে, নৈনিতাল গেছে, শিলং গেছে, কিন্তু ওই সামনের মাঠটা পার হয়ে যে বিরাট শালবন আছে সেখানে যায় নি। আশ্চর্য। এ-কথাটা তার এতদিন একবার মনেও হয়নি। জেঠুই তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

পরীক্ষার কটা দিন বুমবাইর খুব খারাপ গেল। একদম্ড পড়া থেকে উঠতে পারেনি। পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। কিন্তু পরীক্ষার পর আরও খারাপ লাগছিল। বড় দিনের ছুটিতে বাবা এবার কোথাও যাবেনা। কারখানার কি সব মেরামতি কাজ চলছে। বাবার ছুটি মেলেনি। এখন তার হাতে অফুরন্ত সময়। রাস্তা পার হলে, সামনে পার্ক, জেঠু থাকলে পার্কে বসে দু'জনে গল্প করত। জেঠু কবে একবার ঢাইন মাছ শিকারে গিয়েছিল—তার গল্প—বুঝলি বুমবাই নৌকা নিয়েত ভেসে গেলাম। বর্ষাকাল। চারদিকে জল। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, মাইলের পর মাইল

শুধু জল আর জল। আর সেখানে ধানগাছের মধ্যে কত রকমের কীট পতঙ্গ। কোনোটা সবুজ কোনোটা সোনালী—আর যদি কাচ পোকা পাওয়া যেত, তবেত কথাই নেই। তোর ছোট পিসির জন্য কৌটোয় পুরে নিয়ে আসতাম। সে-দেশটা তোরা দেখলি না।

বাবা তাকে একটা বল কিনে দিয়েছে। এখন এটা নিয়েই সে পড়ে থাকে। ওপরের ফ্ল্যাটের লাচিন, মিন্টা নেমে আসে খেলার জন্য। কোয়াটারের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় ওরা বিকেলটায় বল পেটায়। বুমবাই ফাঁক পেলেই জেঠুর গল্প জুড়ে দেয়।

আর মাঝে মাঝে মনে হয় কালীদার দোকান পার হয়ে, হাসপাতাল পার হয়ে, সে চলে যায়। টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে জেঠু যে সামনের মাঠটা পার হয়ে যেতে বলেছিল সেটা পার হয়ে যায়। কিন্তু একা যায় কি করে!

সে মাকে একদিন বলল, মা মিচি বাগানের মাঠ পার হয়ে কোথা যাওয়া যায়? মা বলল, কেন সেখানে কি আছে তোমার? মার ধারণা, সে সেখানে চলে যেতে পারে।

বাবার ধারণা, সে খুব চঞ্চল। সুস্থির হয়ে একদন্ড নাকি সে বসতে শেখেনি। আরও কি যে বলে, বুমবাই, রাস্তায় একা বের হবে না! অপরিচিত লোক কিছু খেতে দিলে খাবে না। কেউ সঙ্গে যেতে বললে যাবে না। যেন চারপাশে ছেলেধরা ওৎ পেতে আছে।

আর জেঠু একেবারে অন্যরকমের।—বুঝলি বুমবাই ফাঁক পেলেই বের হয়ে পড়বি। গাছপালা দেখবি, পাখি দেখবি। নীল আকাশ দেখবি। হেঁটে হেঁটে চলে যাবি যেখানে খুশি মন চায়। সে জেঠুকে নিয়ে ডিয়ার পার্ক গিয়েছিল। জেঠু বলল, কি সুন্দর নারে! আয় আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে থাকি। জেঠু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। সেও শুয়ে পড়েছিল।

এত জায়গায় বেড়াতে গেছে, কখনও মা বাবা তাকে, ছোট বোন নুলিকে এ-ভাবে শুতে শেখায় নি। কেমন ত্রাস সব সময়—ও—মা ও-জায়গাটায় বসে পড়লি। ছিঃ ছি, দ্যাখতো কি ধুলো বালি লাগল। সব গিয়ে ধুতে হবে। কত রকমের ইনফেকসান ক্যারি করতে পারে। গাড়িতে যখন যা খাবার, ভাল করে হাত ধুয়ে তবে খাওয়া। কেবল বাধা নিষেধ। সে কোথাও গিয়ে স্বস্তি পায় না। ভাল করে দৌড়াতে পারে না। একদন্ড চোখের আড়াল হলেই বুমবাই কোথায় গেল?

তার যে মাঠ পার হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। এত বড় মাঠ পার হতে একদিন লেগে যেতে পারে। মাঠের পর শালবন, তারপর সে শুনেছে একটা নদী আছে। গ্রীষ্মের দিনে ওটা বালির চরা হয়ে থাকে। জ্যোৎস্না রাতে ওখানে পরীরা নামে।

লাচিন, মিন্টা একবার সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছিল তাদের বাবা মার সঙ্গে। এক দেহাতী বুড়ো গল্পটা বলেছিল—পরীরা রাতে উড়ে এসে ওখানটায় খেলে। কেউ দেখে ফেললে, সে রাজা হয়ে যায়। লোক লস্কর, ঘোড়সওয়ার সিপাই সান্ত্রী কত কিছু তখন গোপন কথা হয়।

বুমবাই রূপকথার গল্পে ছবিতে এমন কত কাহিনী পড়েছে। জেঠু এলে এ-সব বই দিয়ে যায়। কোন এক দেশে সব গাছপালা মরে যায়। যাদুকর এলে আবার সব গাছপালা পাতা মেলতে থাকে। ফুল ফোটে। পাখিরা উড়ে আসে দূর দেশ থেকে শস্যক্ষেতগুলি ফসলে ভরে যায়। তার মাঝে মাঝে এমন একজন যাদুকর হতে ইচ্ছা যায়। জেঠু একবার বলেছিল, দেখবি, বলেই দুটো আধুলি ওর পকেট থেকে তুলে নিল। ওমা—ওর পকেটতো খালি। আবার বলেছিল দেখবি বলেই চারটে আধুলি ওকে দেখিয়ে দিল। অমন একজন জেঠু যার সেতো যাদুকর হতে চাইবেই। কিন্তু মা টা যে কি না।

বুমবাই টেবিলে চুপচাপ বসেছিল। নুলিটা হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে থাবা মেরে ছবির বইটা নিয়ে গেল। সে কিছু বলল না। মনটা ভাল নেই। জেঠু এবারে টিন টিনের এই বইটা দিয়ে গেছে। টিনটিন আর তার কুকুর। কি মজার মজার কথা টিনটিনের। সে বার বার পড়ে মজা পায়। জেঠুর জন্য পরীক্ষার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে। বাবাকে চুপি চুপি বলেছে, আবার কবে আসবে জেঠু।

বাবা বলেছে, দেখ কবে আসে! মর্জি না হলে কোথাও যায় না।

আবার বুমবাই বলেছে জেঠু এলে চলে যাব।

কোথায় যাবি?

জেঠুর কাছে যাব।

মা শুনে বলেছে, যাও না। জেঠু তোমাকে উদ্ধার করবে। এবারেও তুমি স্ট্যান্ড করতে পারবে না। জেঠু এলেই হাতির পাঁচ পা দেখতে শুরু কর। পড়াশুনা কর না। কেবল মানুষটার পাল্লে পায়ে ঘুর ঘুর কর।

টিনটিনের বইটা নুলি নীচে বিছিয়ে ছবি দেখছে উপুড় হয়ে। অন্য সময় হলে নুলির চুল টেনে ধরত, কান মলে দিত এবং মা এসে বলত, আবার কুরুক্ষেত্র শুরু করলে—কিন্তু আজ সে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। আজ

সে ভাবল জেঠুকে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু মা যদি দেখে ফেলে। জেঠু কত দেশ ঘুরেছে। কত রকমের কাজ করেছে, সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে কতদিন। জাহাজের গল্প, দ্বীপের গল্প, তিমি মাছের গল্প যখন জেঠু বলে তখন সে আর এই বাড়িতে থাকে না যেন। জেঠু তার সত্যি ওয়ান্ডার ল্যান্ড। অথচ মা জেঠুকে দেখলে কেন যে আড়ালে মুখ ভার করে থাকে। বাবার অস্বস্তি। আসলে জেঠুতো বাবার মার পেটের ভাই নয়। মামাতো ভাই।

সে তাড়াতাড়ি আজ খেয়ে দেয়ে তার নিজের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে গেল। এটা তার নিজের ঘর। দরজা বন্ধ করে চিঠি লিখল, জেঠু আমারও কোন ভাই নেই। নিজের ভাই না থাকলে কেউ আপন হয় না। তুমি রাগ করে চলে গেলে। বড় সাধ ছিল একদিন তোমার বাবার ছেলেবেলার মতো আমি পান্তাভাত লেবুপাতা দিয়ে মেখে খাই। মা কিছুতেই রাজি হল না। তোমার ভারি রাগ হল। আজকালকার বৌমারা বড় স্বার্থপর না জেঠু। আমি কিন্তু তোমার মতো হব। যখন যেখানে খুশি চলে যাব। তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাল লাচিনকে নিয়ে সেই মাঠ পার হয়ে যাব। শালবন পার হয়ে গেলে একটা নদী, নদীর চড়ায় পরীরা নামে। জ্যোৎস্না রাতে ওরা সেখানে খেলা করে। আমি পরী দেখতে যাব। সঙ্গে তুমি থাকলে কি মজাটাই না হত।

তারপর চিঠিটা ভাঁজ করল সুন্দর করে। চুরি করে বাবার ডাইরি থেকে খাম এনে রেখেছিল। তার উপর ঠিকানা লিখল—আমার অমল জেঠু। নীচে লিখল ওয়ান্ডার ল্যান্ড। তারপর চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। খুব গোপনে চিঠিটা সে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কেউ জানবে না, সে কাল পরীদের দেশে বেড়াতে যাচ্ছে। কেবল জেঠু চিঠি পেলে জানতে পারবে, তার ভাইপো বড় একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। জেঠু চিঠিটা পেলে কী না খুশি হবে!

(২৬ পাতার শেষাংশ)

পেটের মধ্যে নেকড়ের ডাক চলছিল এতক্ষণ, এবার টের পেলাম। কোন রকম বাক্য ব্যয় না করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করলাম খাবার। তারপর গা এলিয়ে এক একটি কুশনের উপর বসে পড়লাম আমরা।

আর এই প্রথম আমার মনে হল, রাজন হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। তার মুখের উপর দুশ্চিন্তার চিহ্ন।

ব্যাপারটা আমার চোখ এড়ালো না।

কী ব্যাপার, রাজন? বেশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম আমি।

আমার মনে হচ্ছে, খুব তাড়াহুড়ো করেই আগু পিছু না ভেবে একটা বিরাট ঝক্কির মধ্যে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি, ডঃ বাসু?

তার মানে? কারমেলি এবং আমি তার কথা শুনে চমকে উঠলাম।

একটা যান্ত্রিক মানুষের উপর অতটা বিশ্বাস স্থাপন করাটা আমাদের উচিৎ হয় নি। কেমন যেন অন্যমনস্কের মত কথা বলল সে।

চার নম্বর আসলে যে বসে রয়েছে, তার কথাই আমি বলছি, ডঃ বাসু।

সে কি তা হলে রক্ত মাংসের জ্যান্ত মানুষ নয়।

না। কল কব্জার মানুষ রবট। আর যিনি তাকে চালাচ্ছেন তিনি রয়েছেন আমাদের চেয়ে কম করেও তিন কোটি মাইল দূরে। পাইলট জাহাজে। নাম ডঃ কাসামারু।

ডঃ কাসামারু? সেই জাপানী পাগলটা? এবার আমারই পাগল হবার অবস্থা।

হ্যাঁ, ডঃ কাসামারু। বলল রাজন।

তার কথা শুনে মনে হল, মরনের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। তবে তখনও বুঝতে পারিনি, মাত্র ঘন্টা দুয়েক পর মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের পাঞ্জা লড়তে হবে!

[চলবে]

বোকার আনন্দ

এক গ্রীষ্মে সূর্যদেবের বিয়েতে বনের সব পশুপাখি আনন্দে মেতে উঠল। তাই দেখে ব্যাঙরাও সেই উৎসবে যোগ দিল এবং আনন্দে নাচতে লাগল। এক বৃদ্ধ বাঘ তখন বলল, তোমরা বোকা তাই অকারণে পুলকিত হচ্ছ। তোমরা জানো সূর্যদেবের জন্যই সব জলাশয় এই গ্রীষ্মে প্রায় শুকিয়ে গেছে। এরপর উনি বিয়ে করলে ওনার যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন বহু সূর্যের প্রখর তেজে আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবেছ!

শাস্তি

মুস্তাফা নাশাদ

খোকনের বাবা নিয়মিত সকালে-বিকেলে ব্যায়াম করতেন। টেনিস খেলতেন। ঘোড়া ছোটাতেন! কিন্তু; একটি কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারতেন না। শত চেষ্টাতেও না। আর সেটি হ'ল খোকনকে শাসন করা। তাকে তার দুষ্টুমির জন্য শাস্তি দেওয়া।

খোকন যখনই কোন বড় রকমের দুষ্টুমি করত, মামণি অমনি তাকে খোকনের বাবার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে নালিশের সুরে বলতেন, 'একে শাস্তি দাও তো।'

'শাস্তি দেব! কেন? কি আবার করল!' তিনি অবাক হয়ে জিগ্যেস করতেন।

'কেন আবার কি।' মামণি মুখ ঝামটা দিয়ে গজর-গজর করতে-করতে বলতেন, 'তোমার গুণধর মাণিক আজকে আবার নতুন টি-সেটটা ভেঙেছে।'

'ওঃ! তাই না কি?' খোকনের বাবা চোখ নাচিয়ে বলতেন, 'তাহলে তুমিই বরং ওকে শাস্তি দাও। আমি এখন কাগজ পড়তে একটু ব্যস্ত। নীল নদের পর ইংরেজ ও ফরাসীরা মিলে যৌথ আক্রমণ চালিয়েছে।'

'কেন? কেন বলত খোকনের মামণি অভিযোগ ভুলে পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'তাও জান-না?'

'না!'

'নীল নদের হেপাজত করার জন্য! বে ওয়ারিস কিনা তাই!'

'আ পোড়া কপাল! এ আবার কেমন ধরণের হেপাজত করা? হেপাজত করার জন্য আক্রমণ করে বসল!'

'হ্যাঁ! কারণ খোকনের টি-সেটটা ভাঙার আগে যদি তুমি নিজেই ওটা ভেঙে ফেলতে; তাহলে ওকে শাস্তি দেবার জন্য আমাকে আজ এ ভাবে মাথা ঘামাতে হত না।'

'আমি শুধু এইটুকুই আজ তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে খোকন দিনকে দিন দুষ্টুর শিরোমণি হচ্ছে। সেদিকে যেন খেয়াল থাকে। ওকে যদি মাঝে মধ্যে শাসন না কর···তাহলে···পরে···। খোকনের মামণির কান্না পেল।

'একটু সবুর কর। কাগজটা শেষ করে ফেলি। তারপর ভাববো কি করা যায়।' খোকনের বাবা কাগজ পড়াতে মন দিলেন।

কিন্তু খোকনের মামণিও দিব্যি বসে আছেন যে আজ ওকে যে করেই হোক জব্দ করেই ছাড়বেন। তিনি একধারে অভিমান করে বসে রইলেন। আর খোকন? খোকনের তো ভয়েই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! কারণ সে ভালভাবেই জানে যে আজ অবধি বাপী তার গায়ে হাত তোলেনি। তাছাড়া তিনি রোজ ব্যায়াম করেন। ব্যায়াম করার সময় বারবেলগুলোকে এমনভাবে শূণ্যে তুলে ধরেন যে দেখলে মনে হয় ওগুলো যেন বারবেলই নয়। বরং এক একটা গোলাপ. ডালিয়ার ফুল!' কিন্তু আজ

যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম শর্মা।

আজ বুঝি আর ওর রক্ষা নেই। বোধহয় হাড় গোড় কিছুই আর আস্ত থাকবে না। সব দলা পাকিয়ে যাবে। হায়রে পোড়া কপাল!

খোকনের বাবার কিন্তু কোনদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। এক মনে কাগজ পড়ে চলেছেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

গভীর মনোযোগ সহকারে। এমন কি বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ যাচ্ছে না। আর—আর খোকনের মা তাই দেখে দেখে রাগে ফুঁসছেন। তিনি আর থাকতে না পেরে তাঁর হাত থেকে খবরের কাগজটা কেড়ে নিয়ে বললে, 'তুমি দুষ্টটাকে শাস্তি দাও। আমার মাথার দিব্যি।'

'আচ্ছা তুমি ফয়সালা কর আমি এখন কি করি? আমার যে কিছুতেই ওর ওপর রাগ হচ্ছে না। কাজে কাজেই, আজকে তুমিই বরং ওকে শাস্তি দাও, কেমন! আমি না হয় আর একদিন দেব।' খোকনের বাবা মোলায়েম সুরে বললেন। আর খোকনের মামণি প্রায় কেঁদে ফেললেন।

'তুমি দেখছি ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় না পাঠিয়ে কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না।' খোকনের মামণি অভিমান করে তার ঘরে চলে গেলেন।

'খোকন, এদিকে এস।' তার বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি সত্যি বেরসিক। তোমার কোন সময় জ্ঞানই নেই হে। অসময়ে কেউ কখনো দুষ্টুমি করে বুঝি? সময় অসময়ের খেয়াল থাকে না তোমার। এই ঘুঘু ডাকা দুক্কুর বেলা কাউকে ঠেঙানোটা কি খুব ভাল কাজ! তাছাড়া হাতের নাগালের কাছে যুতসই একটা বেত-টেতও তো দেখতে পাচ্ছি না। এখন কি করি বলত? চল, দেখি বাইরে থেকে যদি গাছের এক আধটা ডাল টাল ভেঙে আনতে পারি। এ ব্যাপারে তোমার কি মত?'

খোকনের বাবা খোকনের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন, যেন ওকে আজ কোন ভাল সারকাস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাড়ির কাছেই ছিল বাবলার বন। খোকন ও খোকনের বাবা দুজনে মিলে ভাল-ভাল দেখে কয়েকটা বাবলার ডাল ভাঙল। তারপর ছুরি দিয়ে ভালভাবে ছুলে টুলে বেতের মত করে বাড়ি ফিরল।

'খোকন, দুজনে মিলে পরিশ্রম তো যথেষ্ট করলাম। এখন একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। কেমন?'

'হাঁ-হাঁ। আগে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়াটাই ভাল। সাবধানের মার নেই। কি বল বাপী!' খোকন সোৎসাহে বলল।

খোকনের বাবা 'শপাং' করে তার বালিসের'পর সজোরে এক ঘা কষালেন। বেতটা পটাস্ করে অমনি ভেঙে গেল। আর খোকন ভয়ে লাফিয়ে উঠে তিন হাত দূরে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

খোকনের বাবা মুচকি হেসে জিগ্যেস করলেন, 'এতেই ভয় পেলে হে?

'না—মানে—।' খোকন লজ্জায় জড়সড়।

'দেখলে তো কেমন পটাস্ করে ভেঙে গেল। এখন তুমিই বল তো শুনি, তোমাকে কি ভাবে শাস্তি দি।'

'এ দিয়ে মারলে না মোটেই আঘাত লাগেনা বাপী। এই দেখ।' বলেই খোকন তার উরুতে 'শপাং—শপাং' করে কয়েক ঘা কষাল। আর অমনি সেটাও পটাস করে দু'খানা হয়ে গেল।

খোকনের বাবা আর একটা ডাল হাতে তুলে নিলেন। তার পর সজোরে তার বালিশে এক ঘা কষালেন। শব্দ হল 'শপাং'।

'ওরে বাবা! এ যে সাংঘাতিক।' খোকনের বাবা চোখখানা বড়ো করে বললেন, 'এটা দিয়ে যদি আমি তোমাকে পিটতে শুরু করি, তাহলে তোমার হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না। বুঝলে হে খোকনবাবু। সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। আর তোমার মামণি কাঁদতে শুরু করবেন। তাছাড়া একটা কথা কি জান বন্ধু! তোমাকে তিনি শাস্তি দিতে বলেছেন সেরেফ। হাড়গোড় তো ভাঙতে বলেননি। am I ঠিক?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ বাপী।' খোকন বিজ্ঞের মত বলল, 'সমস্ত বেতই একে-একে ভেঙে গেল। একটিও টিঁকল না।'

'তাহলে এবার তুমিই বলবে এখন তোমাকে আমি কি করে শাস্তি দি?' খোকনের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বাপীকে এভাবে চিন্তিত হতে দেখে খোকনের এবার সত্যি-সত্যি কান্না পেল।

'কি শ্রীমান? অমন বোকার মত হাঁ করে বসে রইলে কেন? একটা ভাল দেখে যুতসই বেতটেত যোগাড় কর।'

'বাপী?'

'কী খোকন?'

'তোমার ঘোড়া ছোটাবার যে বেতটা আছে না···।'

'হাঁ, হাঁ।'

'ওটাই সব থেকে ফাইন! খুব মোটাও নয়। তাছাড়া আমার হাড়গোড়ও ভাঙবেনা। কি বল?'

'যা বলেছ! বাপকা বেটা—সেপাইকা ঘোড়া। কুচ না হো তো থোড়া থোড়া। বাঃ।' বাপী আনন্দে গদ-গদ হয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি বেশ চালাক হে। তাহলে ওটাই নিয়ে এস! কেমন!

'আঁ—হাঁ।'

খোকন আনন্দে ছুটল বেত নিয়ে আসতে।

খোকনের মামণি এ ধারে তার কামরায় বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিলেন। আর মনে-মনে আক্ষেপ করছিলেন যে খামখা কেনই যে তিনি খোকনের বাপীকে খোকনকে শাস্তি দিতে বললেন। বালিশের উপর বেত পড়ার 'শপাং-শপাং'

শব্দ শুনে তিনি ভয়ে শিউরে উঠছিলেন ; যাতে তিনি তাঁর পরম আদরের সন্তানের হৃদয় বিদারক কান্নার শব্দ না শুনতে পান আর কি। কিন্তু হঠাৎ খোকনকে এভাবে হাসি মুখে ছুটে আসতে দেখে তিনি একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।

'বেত খুঁজতে যাচ্ছি মা!' খোকন যেতে-যেতে বলল, 'একটা বেতও মজবুত বেরুল না।'

খোকন যখন বেত নিয়ে পৌঁছল তখন খোকনের বাবা আবার কাগজ পড়তে শুরু করেছেন।

'এই নাও বাপী।' খোকন বুক ফুলিয়ে বলল।

'এটা ভাঙবে না তো?' বাপী তার সন্দেহ প্রকাশ করল।

'বালিশের উপর একবার পরীক্ষা করে দেখব বাপী

খোকন 'শপাং-শপাং' করে বালিশের উপর এলো পাথাড়ি ভাবে বেত কষাতে শুরু করল। যেন সে নিজেকেই পিটছে আর কি! আর খোকনের বাবা নির্বিকার চিত্তে কাগজ পড়ে চললেন।

'এটা মনে হচ্ছে ভাঙবে না।' খোকনের বাবা হাই তুলে বললেন, 'কিন্তু বাছাধন কাউকে পেটা অত সহজ কাজ নয়। এই দেখনা, তুমি নিজেই কেমন শ্রান্ত হয়ে পড়লে।'

'তা যা বলেছ বাপী!'

'একটা কাজ করবে?'

'কি কাজ? বল না!'

'তুমি আর এভাবে দুষ্টুমি কোরোনা! তাহলে আমি বরং খুশিই হব। দুষ্টুমি করলে তোমার মামণিও দুঃখ পান। শোন—একান্তই যদি তোমার দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে, তাহলে আগে থেকেই আমাকে জানিয়ে দিও। কেমন! কেন বলছি জান আগে থেকে জানা থাকলে সে দিন আর আমি ব্যায়াম করব না। তাহলে মনের সুখে তোমাকে পেটাতে পারব। তাছাড়া রোববারের দুপুরটাও এভাবে মাঠে মারা যাবে না। বুঝলে তো!'

'বুঝলাম!' নীরবে খোকন মাথা হেঁট করে বলল।

খোকনের বাবা তার ঘরে মনমরা হয়ে বসে রয়েছেন। আর খোকনের মামণি তার কামরায় চোখের জলে এক নাগাড়ে বুক ভাসিয়ে চলেছেন। তাই দেখে লজ্জায় আর অপমানে খোকনের মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে গেল। তার দেহে বেতের কোন দাগ পড়েনি সত্য। কিন্তু তার মনে এমন একটা দাগ কাটল যা কোন দিনও মুছে যাবার নয়। খোকন গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে গেল তার মামণির কাছে। তারপর তার কাছে অপরাধ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে, গলা জড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল যে ভবিষ্যতে সে আর কোনদিন দুষ্টুমি করবে না!

ইসমাত্ চুগতাই-য়ের উর্দু গল্প 'সাজা'র অনুবাদ।

যদি

সরল দে

বাঘ যদি হয় নরম-সরম
যায় ভুলে রাগ-হিংসে,
মুগ্ধ চোখে দেখবে তখন
বনহরিণের শিং সে।

বাঘ যদি হয় নরম-সরম
রাগ ভুলে হয় তুলতুলে,
মন্দমধুর গন্ধ নেবে
নাকের কাছে ফুল তুলে।

হিংসে ভুলে বাঘ যদি হয়
শান্ত এবং শিষ্ট,
জপের মালা খাবায় নিয়ে
বলবে, হরেকিষ্ট!

বাঘ যদি হয় নরম-সরম
রাগ ভুলে হয় তুলতুলে
মৌমাছিরাই আসবে তেড়ে
বিষ-মাখানো হুল তুলে॥

এস ম্যাজিক শেখাই

যাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

আষাঢ়ে এক বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় যাদুর আসর বসেছে।

সকলেরই ইচ্ছা আজ খাওয়া নিয়ে যাদু দেখানো হোক। যাদুকর যেন যাদুমন্ত্রেই সে কথা টের পেলেন। একগাল হেসে একজন দর্শককে ডেকে প্রশ্ন করলেন, কি খাবেন ?

সে বলল এক কাপ কফি পেলে খুব খুশী হই। কফি ? এ আর এমন কি ! যাদুকর সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ গরম কফি বাড়িয়ে দিলেন দর্শকটিকে।

দর্শকটি কাপে চুমুক দিয়ে, মুখটা বিকৃত করে বললে, ইস্ এ যে চা—

এবার তাহলে শোন, কেমন করে হল।

যে চামচটা দিয়ে পরে চা গোলানো হল এটা ঠিক সাধারণ চামচ নয়। এই চামচের ডাঁটিটা ফাঁপা এবং এর দু'প্রান্তে দু'টি ছিদ্র আছে। নীচের ছিদ্রটা দিয়েই কফি বের হয়।

কফির গুঁড়ো আগেই এই চামচে ঢোকানো থাকে। যাদুকর চামচটা চা-এ ডুবিয়ে ওপরের ছিদ্রে আঙ্গুলের চাপ দিলেই, কফি গুঁড়ো নীচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে চা-এ মিশে যায় এবং কফিতে পরিণত হয়।

দর্শক ভাবে বুঝিবা যাদুর খে-লা !

তাই নাকি ? যাদুকর হাসলেন। টেবিলের ওপর থেকে একটা খালি চামচ তুলে নিয়ে, চায়ের কাপে ডুবিয়ে দিয়ে বললেন, এবার খেয়ে দেখুন তো—

চা আর চা নেই। নিমেষে কফি হয়ে গেল।

খেলাটা খুবই মজার তাই না ?

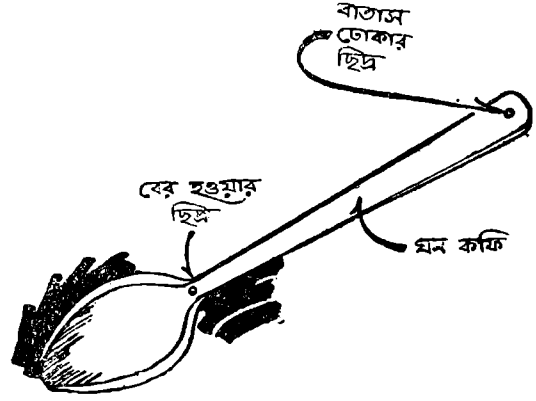

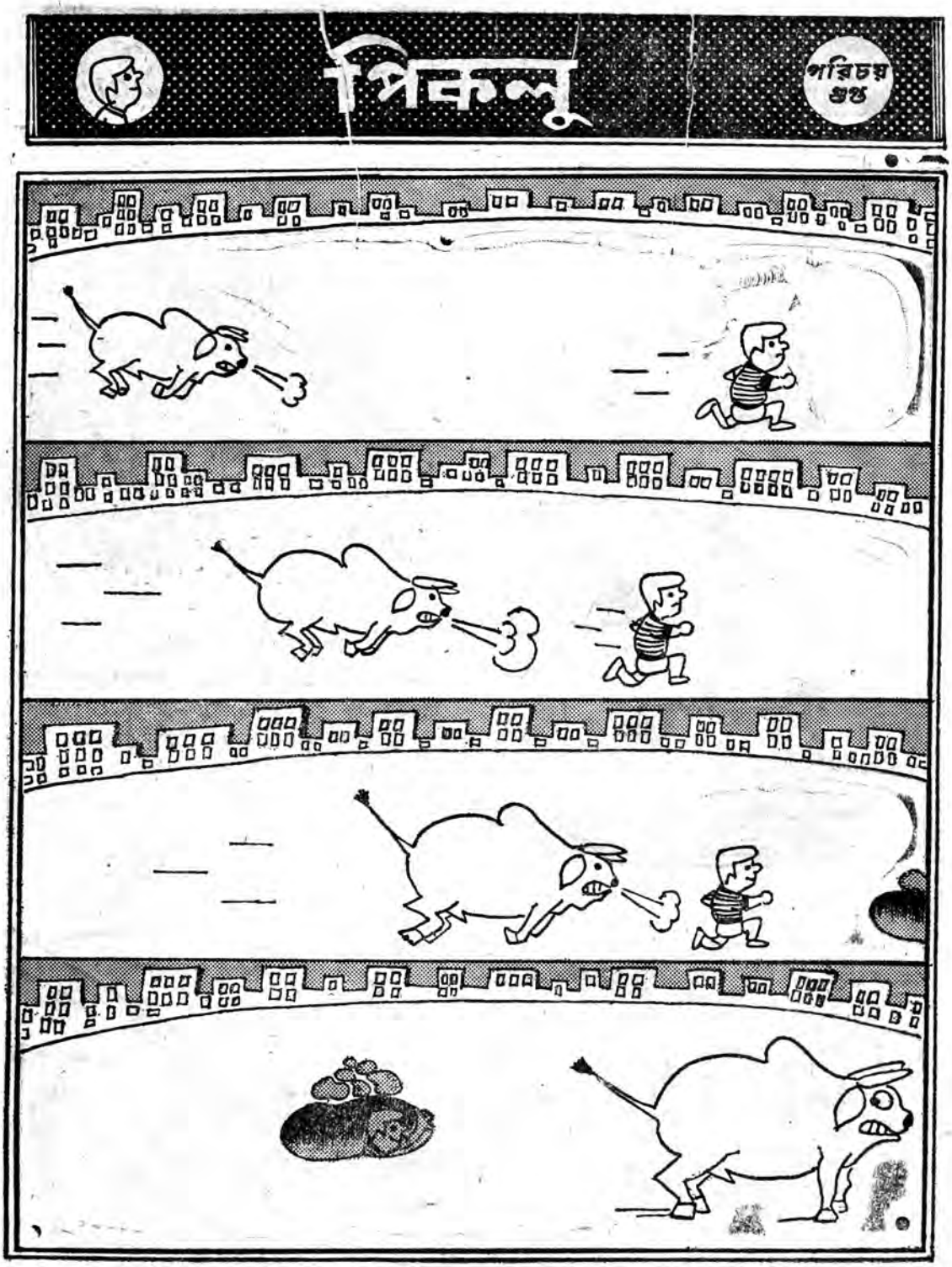

পিকলু
পরিচয়

তোমার প্রিয় — আমার প্রিয়

ছবি ঃ মনোজিৎ চন্দ

পয়সা নেই।

টিকিট কেটে মাঠে ঢুকতে পারবে না ওরা। মাঠের বাইরে আশেপাশের গাছগুলোও প্রায় ভরা। কোথাও জায়গা নেই। ওরা ক'জন ঘুরতে লাগলো। প্যাভেলিয়নের কাছাকাছি একটা গাছে ওঠা চলে। দু-এক জনের বেশি নেই গাছটায়। চটপট চড়ে বসলো ওরা। তারপর সারাটা দিন মাঠের ব্যাট-বলের কলতানে মুখর হয়ে উঠতে লাগলো বাইরের গাছগুলো।

ওদের মধ্যে সব চেয়ে ঢ্যাঙ্গা যে সেই ছেলেটিই সবচেয়ে ওপরে চড়ে বসেছে। মোটেই মোটা-সোটা নয় ডালটা। ওর ভারেই একটু ঝুলে পড়েছে। আর যদি চাপ পড়ে ডালটা তাহ'লে নির্ঘাৎ ভেঙ্গে পড়বে। দিব্যি কেটে গেলো সারাটা দিন।

খেলা শেষ। মাঠ থেকে দর্শকরা বেরিয়ে পড়েছেন। গাছগুলো থেকে ছোট-বড় সকলে নেমে পড়ছে। ছেলেটি তাকালো নীচের দিকে। বন্ধুরা সব নেমে গেছে। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো এক ভদ্রমহিলার দিকে। খুব সাজগোজ করে খেলা দেখতে এসেছিলেন। এখন বাড়ি যাচ্ছেন।

ছেলেবেলার গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেলো ওর মাথায়। দেখতে দেখতে ভদ্রমহিলা এসে গেলেন গাছতলার কাছাকাছি। ছেলেটিও নরম ডালের আগার দিকে এগিয়ে গেলো। দু হাত দিয়ে ডালটা ধরে ঝুলে পড়লো নীচের দিকে। তারপর ভদ্রমহিলার ঠিক সামনে ঝুপ করে নেমে পড়লো গাছ থেকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তাই দেখে হেসে উঠলো ঢ্যাঙ্গা ছেলেটা। কুচকুচে কালো মুখে চকচকে সাদা দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠলো। ব্যাপারটা কি ভদ্রমহিলা ভালোভাবে বোঝার আগেই হৈ হৈ করে হাসতে হাসতে ছেলেগুলো চলে গেলো। এখন যে যার বাড়ি যাবে। কাল সকালে আবার হাজির হবে সমুদ্রের ধারে। সেখানে বসবে ওদের নিজেদের টেস্ট ক্রিকেটের আসর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক নীচে অতলান্ত সাগরের বুকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো দ্বীপ। কোনটার নাম ত্রিনিদাদ, কোনটা বৃটিশ গিয়ানা, কোনটা বারনাডোজ।

বেলাভূমি ডিঙ্গোলেই চোখে পড়বে আখের খেত। লম্বা লম্বা পাম গাছের সারি। দূরে পাহাড়ের গায় সূর্যের চোখ ধাঁধানো আলো। বেলাভূমির এখানে ওখানে জেলেদের জাল রোদে শুকোচ্ছে। তার পাশে চলছে ছোট ছোট ছেলেদের বিচ ক্রিকেট খেলা। সমুদ্রের ধারে ক্রিকেট খেলা ঐ দ্বীপগুলোর ছেলেদের কাছে নিত্য ব্যাপার। ওরা খেলবেই। খেলা শেষ হলে পিচ বাধানো রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি যাবে।

ছোট ছোট ছেলেদের একটা দল প্রায় সারাদিনই নদীর ধারে পড়ে থাকে। একটা ব্যাটের মতো কাঠের টুকরো, আর একটা ছেঁড়া বল। তাই নিয়েই ওদের টেস্ট ম্যাচ চলে। শুধু 'লাঞ্চ' আর 'টি'য়ের সময় বিশ্রাম। লাঞ্চের সময় ওরা এসে বসে নারকেল গাছের তলায়। মিষ্টি জল আর শাঁস দিয়ে ওদের লাঞ্চ হয়। কোন কোন দিন জেলেদের

কাছ থেকে মাছ পেয়ে যায়। বালির ওপর সেটা ওরা পুড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর আবার শুরু হয় খেলা।

আবার এক একদিন দেখা যায় হাতে পয়সা নিয়ে ওরা রাস্তা দিয়ে বাঁই বাঁই করে ছুটছে। কেনসিংটন ওভাল মাঠে গিয়ে টিকিট কেটে ঢুকে পড়ে মাঠে। ব্রিজটাউনে টেস্ট ম্যাচ থাকলে অবস্থাটাই বদলে যায়। স্কুলে হাফ-হলি-ডে। অফিস বন্ধ। দশটার আগেই মাঠ ভরে যাবে।

ছোট ছেলেদের দলে সব চেয়ে যে ঢ্যাঙ্গা তার নাম হল ওয়েস হল। বন্ধুরা ওয়েস বলে ডাকে। ওয়েসের বয়েস তখন তেরো (জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭)। পড়ে কম্বারমেয়ার হাই স্কুলে। স্কুল টিমে খেলে। ওয়েস তখন ব্যাটসম্যান 'স্কুলের জুনিয়ার দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করে। একদিন ওয়েস দারুণ খেললো লিওয়ার্ডের বিরুদ্ধে।

অধিনায়ক গ্লেন হেওয়ার্ডের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ২০২ রান তুললো। এর মধ্যে ওয়েসের সংগ্রহ ৯২।

সেদিন শনিবার। সোমবার স্কুল বসার ঠিক আগে ঘটলো ঘটনাটা। প্রেয়ারের পরেই হেডমাস্টারমশাই মেজর সিসিল নোট এগিয়ে এলেন ওয়েসের দিকে। নতুন একজোড়া ক্রিকেট-বুট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পরে খেলতে বোধহয় আরো সুবিধে হবে। এর পরেই হল স্কুলের বড়দের দলে চ্যান্স পেয়ে গেলো। ফ্রাঙ্ক কিং তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা ফাস্ট বোলার। তিনি ছিলেন হলদের স্কুলের হেড গ্রাউন্ডসম্যান। তাই তিনিও স্কুল দলে খেলতেন। এই দলে খেলার জন্যে ছাত্রদের মধ্যে দারুন প্রতিযোগিতা চলতো। হল ভাবলো, শুধু ব্যাটিংয়ের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আরো কিছু করতে হবে। কি করবে সে? বোলিং না, ওসব ওকে দিয়ে হবে না। ঐ সময়ই ওর হাতে এলো ইংলন্ডের উইকেটকিপার গডয়ে ইভান্ডোর লেখা 'বিহাইন্ড দ্য স্টাম্পস' বইটা। মন দিয়ে পড়ে ও দাঁড়িয়ে গেলো উইকেটের পেছনে। সমুদ্রের ধারে ওদের খেলায় হল তখন উইকেটরক্ষক। সারা গরমকালটা ও প্র্যাকটিশ করলো। পরের বছর থেকেই ওয়েস হল ওদের স্কুলের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান হয়ে গেলো। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সে ঐ স্কুলে ছিলো।

স্কুল থেকে বেরিয়েই ওয়েস হল কাজে যোগ দিল ব্রিজটাউনের এক 'কেব্‌ল অফিসে'। খেলার জন্যেই চাকরীটা পেলো। অবশ্য কাজও ঠিকঠাক করতে হতো। সেদিন হলদের কেব্‌ল অফিসের সঙ্গে বার্বাডোজের খুব নামকরা ক্লাব ওয়ানডারসের খেলা।

মাঠে টস করতে গেছেন দু দলের অধিনায়ক। হল ড্রেসিংরুমে বসে বসে প্যাড বাঁধতে লাগলো। ওরা টসে জিতলে হল ব্যাট করতে নামবে। আর হারলে উইকেট কিপিং করবে।

হঠাৎ ওদের ক্যাপ্টেন সোনি গিলিস দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হলকে প্যাড পরতে দেখে এগিয়ে এলেন ওর কাছে। বললেন,

ওয়েস খুব ঝামেলা হয়ে গেছে যে!

কি?

আমাদের একজন পেস বোলার আসে নি। আমার ইচ্ছে, তুমি বোলিং শুরু করো।

চমকে উঠে দাঁড়ালো হল।

আমি বল করবো? অসম্ভব। জীবনে কোনদিন বোলিং করিনি।

তা হোক। আজ করবে। প্যাড খোল। চল বোলিং শুরু করবে। কি আর করবে বল। নেমে পড়লো মাঠে। বিচ ক্রিকেটে যেমন ছাব্বিশ পা ছুটে বল করতো—সেইভাবে বোলিং শুরু করলো। আর শেষ পর্যন্ত ছ'ছটা উইকেট পেয়ে গেলো সে। সুতরাং উইকেট কিপারের প্যাড খুলে হলকে এর পর থেকে হাতে তুলে নিতে হল নতুন বল।

ওদিকে ইংলন্ডের নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া একটা দল নিয়ে সোয়ানটন সাহেব বার্বাডোজে এসেছেন। বার্বাডোজের পক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলার জন্যে হলকে মনোনীত করা হলো। টম গ্রেভনির হাতে বেদম মার খেলো সে। কলিন কাউড্রেও মেরে খেলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হলের বলেই তাঁকে আউট হতে হল।

সফরের শেষে সোয়ানটনকে বলা হল সব থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়ের নাম করতে।

একটুও না ভেবে সোয়ানটন ওয়েস হলের নাম করে বসলেন। বললেন, ফাস্ট বোলার হিসেবে ওকেই তাঁর সব থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড় বলে মনে হয়েছে।

সোয়ানটন সাহেবের সার্টিফিকেটের দাম অনেক। হল তাই দারুণ খুশি। আনন্দে সে আরো জোরে বল করতে লাগলো। ততোদিনে বার্বাডোজের সব জায়গাতেই তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

ওদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ইংলন্ড সফরের তোড়জোড় চলছে। কে দলে আসবে আর কে আসবে না—তাই নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়ের নাম শোনা যাচ্ছে। হলের নামও কেউ কেউ বলছেন। ওয়েস অবশ্য অতদূর ভাবতে পারে না। তবু মনের মধ্যেটা কেমন যেন করে। মাঝে মাঝে আশায় আশায় ভরে ওঠে মন। পরমুহূর্তে মনে হয় ওতো নেহাতই বাচ্চা। ও কি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে চ্যান্স পাবে।

সেই সময় বৃটিশ গিয়ানায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলোর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হচ্ছে। এই খেলাগুলিই জাতীয় দলে স্থান পাবার নির্বাচনী প্রতিযোগিতা।

বার্বাডোজ দল গিয়ানায় খেলতে যাচ্ছে। দল গড়া হলো। না, ওয়েস হল নেই সেই দলে। বাদ পড়েছে সে। সুতরাং ইংলন্ড যাবার আর কোন চ্যান্সই নেই। হলের খুব মন খারাপ হয়ে গেলো ঠিকই কিন্তু একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত সে। আর আশা—নিরাশার দোলায় দুলতে হবে না তাকে।

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল হল বুঝতেও পারলো না। গিয়ানার প্রতিযোগিতার পরই ফ্রাঙ্ককিং

[এরপর ২৭ পাতায়]

যোগাসন

যোগী

(৭) **কুক্কুটাসন** ঃ প্রথমে পদ্মাসনে বসো। এবারে ডান পায়ের গোড়ালীর সামনে দিয়ে বাঁ হাত, বাঁ পায়ের গোড়ালীর সামনে দিয়ে ডান হাত যথাক্রমে ফাঁকের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে মাটিতে রাখ। তারপর ছবির মত হাতের তালুর ওপর ভর দিয়ে আসনবন্ধ অবস্থায় শরীরটাকে কনুই পর্যন্ত তোলার চেষ্টা কর। এই অবস্থায় সামর্থমত ১০/৩০ সেকেন্ড থাকো। তারপর শরীরটাকে নামিয়ে নাও এবং ৩০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পদ্মাসনের মত পা পরিবর্তন করে ৩/৪ বার অভ্যাস করো। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। শেষে শবাসন করবে।

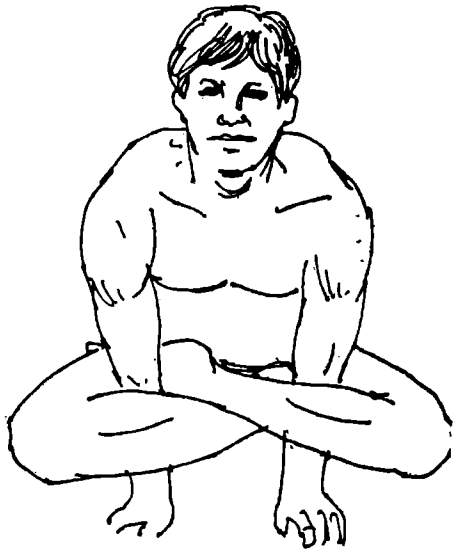

কুক্কুটাসন

উপকারিতা ঃ হাতের পেশী সবল ও কব্জি সুদৃঢ় হয়। বুকের ও কাঁধের পেশী সবল হয়। দুর্বল পরিপাক যন্ত্রকে সবল করে। সুষুম্না নাড়ীর বন্ধ দরজা খুলে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে হয়। দেহকে কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মক্ষম করে।

(৮) **ঊর্দ্ধ কুক্কুটাসন** ঃ প্রথমে পদ্মাসনে বসো। এবারে ছবির মত দুহাতের তালুতে ভর দিয়ে পদ্মাসন অবস্থায় শরীরটাকে যতদূর সম্ভব ওপরে তোলবার চেষ্টা করো। শ্বাস স্বাভাবিক রাখবে। এভাবে পা পরিবর্তন করে (পদ্মাসনের মত) ৩/৪ বার করো। শেষে শবাসন করবে।

ঊর্দ্ধ কুক্কুটাসন

উপকারিতা ঃ কাঁধের অসমতা দূর করে এবং হাতের শক্তি বাড়ায়।

(৯) **গোমুখাসন** ঃ সামনে দুপা ছড়িয়ে সোজা হয়ে বসো। এখন ডান পা হাঁটু ভেঙ্গে বাঁ পায়ের নীচে এনে ডান পায়ের গোড়ালী দিয়ে বাঁ পাছা স্পর্শ করো।

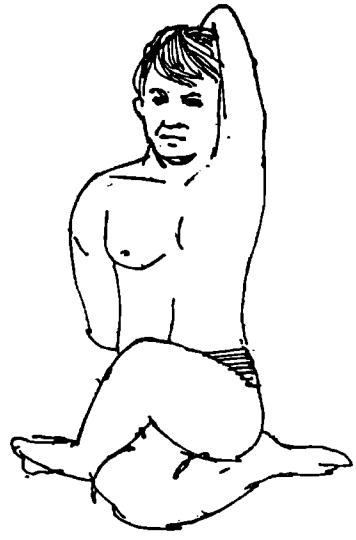

গোমুখাসন (সামনে থেকে)

এবারে বাঁ পা হাঁটু ভেঙ্গে ডান পায়ের উপর দিয়ে নিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালী দিয়ে ডান পাছা স্পর্শ করো। এবারে বাঁ

হাত মাথার উপর তুলে কনুই ভেঙ্গে পিঠের দিকে নামাও এবং ডান হাত কনুই ভেঙ্গে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে ছবির মত বাঁ হাতের আঙ্গুল ধরো। লক্ষ্য রাখবে, দুহাতের আঙ্গুলগুলো বাঁকিয়ে যেন হুকের মত আঁকড়ে ধরা হয়। এভাবে শ্বাস স্বাভাবিক রেখে মেরুদন্ড সোজা করে ৩০ সেকেন্ড থাকো। পরে হাত ও পা বদলে অর্থাৎ বাঁ পা নীচে ও ডান পা উপরে দিয়ে হাঁটুর ওপর হাঁটু রেখে এবং গোড়ালী দুটো বিপরীত পাছায় স্পর্শ করে ডান হাত মাথার ওপর তুলে কনুই ভেঙ্গে পিঠের দিকে নিয়ে ও বাঁ হাত কনুই ভেঙ্গে পিঠের দিকে নিয়ে দু হাতের আঙ্গুল আগের মত ধরে মেরুদন্ড সোজা রেখে ও শ্বাস স্বাভাবিক রেখে ৩০ সেকেন্ড থাকো। এই আসন পা বদল করে প্রতি পায়ে ৩ বার করে দুপায়ে ৬ বার করো। মনে রাখবে এই আসনে যখন যে পা ওপরে থাকবে তখন সে হাত ওপরে থাকবে এবং যে পা নীচে থাকবে সে হাতও নীচে থাকবে।

উপকারিতা ঃ এই আসনে পায়ের বাত, সায়াটিকা বাত, অর্শ, মূত্রপ্রদাহ, ইনসমনিয়া (নিদ্রাহীনতা) দূর করে ও কাম রিপুকে শান্ত রাখে। মনের চঞ্চলতা ও কুচিন্তা দূর করে, ব্রহ্মচর্য রক্ষায় সহায়তা করে এবং স্বপ্নদোষ দূর করে। রাতে শোবার আগে এই আসন করে শয্যা নিলে ঘুম ভালো হয়।

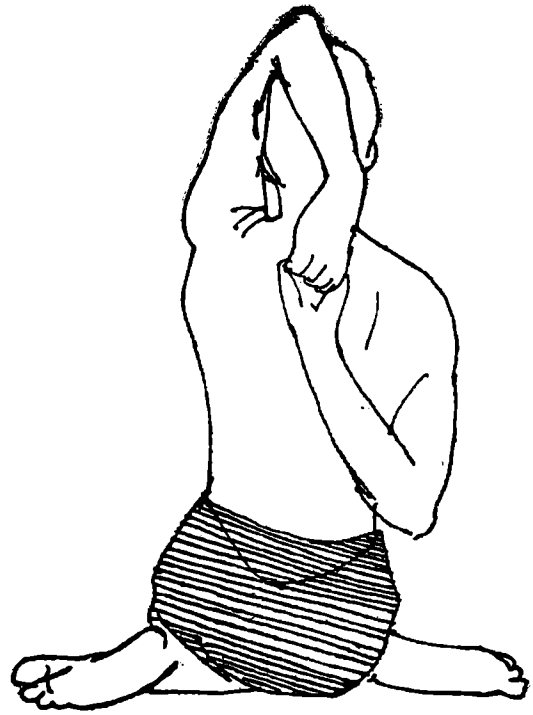

গোমুখাসন (পেছন থেকে)

[২৬ পাতার শেষাংশ]

অবসর গ্রহণ করলেন। কিংয়ের জায়গায় কে আসবে ?

হঠাৎ একদিন হলের কেবল অফিসে টেলিগ্রাম এসে হাজির —এক্ষুনি ত্রিনিদাদে চলে এসো।

ত্রিনিদাদে তখন ট্র্যায়াল ম্যাচ হচ্ছে। একদলের অধিনায়ক ইভারটন উইকস। অন্য দলের ক্লাইভ ওয়ালকট। উইকসের দলে ছিলো হল। প্রথম ম্যাচে সে তেমন সুবিধে করতে পারলো না। রান পেল না। উইকেটেও ভরে উঠলো না তার ঝুলি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচটায় ভাল খেললো। ৭৭ রান করলো। কয়েকটা উইকেটও পেলো।

হল জানতো তার কোন চান্সই নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে স্থান পাবার মতো সে খেলতে পারেনি। খেলার শেষেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। অফিস তো আছে।

দ্বিতীয় ম্যাচের শেষদিনে নির্বাচকরা মিটিংয়ে বসেছেন। ইংলন্ডগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সতেরো জন খেলোয়াড়ের নাম সেইদিনই তাঁরা ঘোষণা করবেন। ব্যাপারটা নিয়ে কয়েকজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। হল নির্বিকার। সে তো জানে, তার কোন চান্সই নেই।

খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে নামগুলো টানিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে খেলোয়াড়দের ভিড়। হল এগিয়ে গেলো। দেখাই যাক না কে কে চান্স পেয়েছে। পায় পায় এগিয়ে গেলো। সকলের চেয়ে লম্বা সে। পেছনে দাঁড়িয়ে মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো। দিব্যি পড়তে পারছে নাম গুলো। ঐ তো···

আলেকজান্ডার, আসগর আলি, অ্যাটকিনসন···গিলক্রিষ্ট, গডার্ড, ভ্যালেনটাইন, সোবার্স, উইকস, ওরেল, ওয়ালকট···

না হলের কোন জায়গা নেই ঐ তালিকায়।

হঠাৎ একটা জায়গায় হলের দু চোখ আটকে গেল। ওকি ? কি লেখা ? হল চোখ সরাতে পারছে না। কি লেখা আছে ? তার নাম নাকি···হল ডব্লিউ ডব্লিউ···

পেছনে ওকে দেখেই কয়েকজন হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কনগ্রাচুলেশন হল। তুমি চান্স পেয়েছো···।

আষাঢ় ঃ **এক্সেসি**

মফঃস্বলের এই বিশাল বাগানবাড়ীটার পেছনদিকে বেশ সুন্দর একটা চিলড্রেন্‌স্‌ পার্ক তৈরি করিয়েছিলেন পল্টুর ঠাকুরদাদা, সেটা এখনও মোটামুটি ভালোই সাজানো আছে। স্লিপ, সী-স, সুইং এসব ত' আছেই, তাছাড়া আছে খোলা মাঠ, ঝোপজঙ্গল, আঁকাবাঁকা সরু খাল, ছোটবড় অনেকগুলো পুকুর, এমনকি ময়ূর, বানর, খরগোশ এসব নিয়ে একটা চিড়িয়াখানাও। স্কুলের ছুটি পড়লে যখনই মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসে ওরা, তখন পল্টু আর মিন্টু দুই ভাই-এর বেশীর ভাগ সময় কাটে এই বাগানেই। আজ দেখা যাচ্ছে ছুটোছুটি বন্ধ করে দু'জনে একটা পুকুরের ধারে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে বাগানের মালী সনাতন। কারণটা শোন। পুকুরটা চারকোণা, মাঝখানে আবার একটা চারকোণা দ্বীপ রয়েছে। দ্বীপের উপর একটা বেশ বড় সাইজের ডিম পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে, রোদে চকচক করছে সেটা। ওটা কিসের ডিম এই নিয়ে দু'ভাই-য়ে কিছুক্ষণ তর্ক হয়েছে,—হাঁসের, কাকের না খরগোশের। শেষে তর্ক থামিয়ে ওরা ডিমটাকে সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছে। বাগানের একটা জায়গায় অনেকগুলো তক্তা পড়ে আছে, সনাতনের সাহায্যে সেই তক্তাই একটা আনিয়েছে ওরা। কিন্তু পুকুরের ধার থেকে দ্বীপের মাটি পর্যন্ত ঠিক পেঁছচ্ছে না তক্তাটা, সামান্য একটু ছোট হচ্ছে। মিন্টু বলল, 'আরও তক্তা নিয়ে আসি।' 'দূর বোকা, তাতে কি হবে,' বলল পল্টু। 'সব তক্তাই ত' একমাপের। জোড়া লাগাবি নাকি? কি করে জোড়া লাগাবি?' এইটাই ওদের ভাবিয়ে তুলেছে। সমাধান একটা বলতে পার?

২। ন'টা বল আছে, সবগুলো একরকম দেখতে, একরকম ওজন। শুধু একটা বলের ওজন একটু কম। ওজন পাল্লা আছে, কোনো বাটখারা নেই। দু'বার ওজন পাল্লাটা ব্যবহার করে বলতে হবে কোন বলটার ওজন কম।

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

ধরা যাক, বিদিশাদের বাড়ীর দিকের বাস নিত্যানন্দবাবুদের স্টপে আসে ৪টে ৫ মিনিটে, ৪টে ৩৫ মিনিটে ও ৫টা ৫ মিনিটে। আর অবন্তিকার বাড়ীর দিকের বাস আসে ৪টে ১০ মিনিটে, ৪টে ৪০ মিনিটে, ৫টা ১০ মিনিটে এইরকম। তাহলে ৪টে ৫ থেকে ৪টে ১০ পর্যন্ত ৫ মিনিটের মধ্যে যদি নিত্যানন্দবাবু স্টপেজে পেঁছান তবে অবন্তিকার বাড়ীতে যান; আর ৪টে ১০ থেকে ৪টে ৩৫ পর্যন্ত ২৫ মিনিটের কোনো সময় পেঁছুলে যান বিদিশার বাড়ী। এ ক্ষেত্রে বিদিশার বাড়ীতেই তাঁর যাওয়া পড়বে অনেক বেশী।

নির্ভুল উত্তরদাতা ঃ

রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ—আরামবাগ, হুগলী। শুভ চৌধুরী (গ্রা. ২০৯৫)— হাইলাকান্দি, কাছাড়। সোনালী ঘোষ—পারক সারকাস। হরেকৃষ্ণ, মনোরমা, মদনমোহন, বিদ্যুৎরাণী ও দীপ্তিরাণী সামন্ত—বিজয়গড়, যাদবপুর।

সুব্রত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া দুটি এবং তৃতীয় হইতে দশম স্থানাধিকারীদের নাম প্রকাশ করা হল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারীদের ছড়াও প্রকাশ করা হবে।

তৃতীয় ঃ সৌগত পুরকায়স্থ
করিমগঞ্জ, কাছাড়।

চতুর্থ ঃ নিতাই নস্কর
সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

পঞ্চম ঃ রতন বড়ুয়া
ডিগবয়, আসাম।

ষষ্ঠ ঃ কৌস্তভ দাসবকসী
(গ্রা. ১০৮৭)
দেবগ্রাম, নদীয়া।

সপ্তম ঃ নিখিল মন্ডল চট্টোপাধ্যায়
মটুকবণী, বাঁকুড়া।

অষ্টম ঃ সীমা দাস
বাঁশবাড়ী, মালদা।

নবম ঃ ঝলক দত্ত
নতুনপাড়া, হাইলাকান্দি, কাছাড়।

দশম ঃ অরুণাশিস্‌ দত্ত
৫৮ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৬।

চুনো পুঁটি

চল পুঁটি, আমার এই সাইকেলটা করে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি
না ভাই, আমার একটু কাজ আছে

ঠিক আছে, তাহলে আমি একাই একটু ঘুরে আসি
তাই যা

টা-টা,-

মিনিট পনেরো পর
আরে, চুনো ওকি করছে!

আরে পুঁটি তুই!
আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি। এ ভাবে শূণ্য মার্গে আর কতক্ষণ ভ্রমণ করবি?

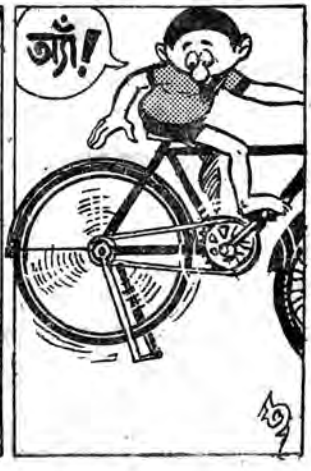
অ্যাঁ!

ভেবে ভেবে সমাধান

সব সূত্রই সহজ নয়। না পারলে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। এটি তৈরি করেছেন

শাব্দিক

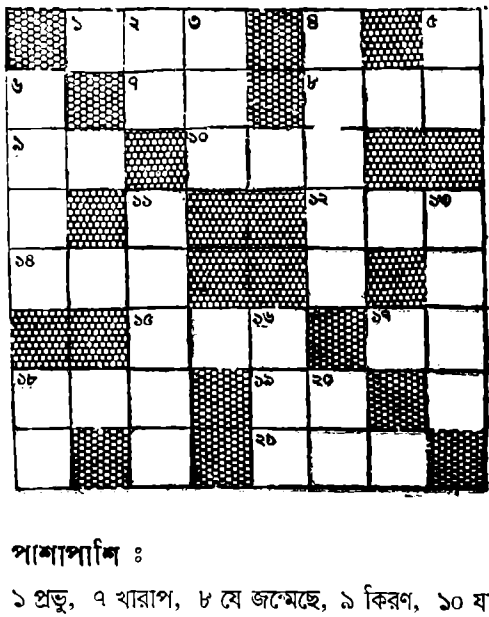

পাশাপাশি ঃ

১ প্রভু, ৭ খারাপ, ৮ যে জন্মেছে, ৯ কিরণ, ১০ যাকে নোয়ানো হয়েছে, ১২ মৃতদেহ পোড়ানো হয় যেখানে, ১৪ এক জাতীয় মাছ, ১৫ শহর, ১৭ কালকূটের লেখা যে উপন্যাসটি আকাদেমী পুরস্কার পেয়েছে, ১৮ শোবার সময় চাই, ১৯ ভূমি, ২১ লিখবার কাজে লাগে।

উপর-নীচ ঃ

২ পেনে থাকে, ৩ মুখ, ৪ যার দাড়ি ওঠে নি, ৫ চোখ মুখের মাঝে থাকে, ৬ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন, ১১ চলবার ক্ষমতা, ১৩ ইংরাজী বছরের এগারো মাস, ১৬ ধোবা, ১৮ বাগান, ২০ মিলন।

বৈশাখ মাসের ভেবে ভেবে সমাধান-এর উত্তর

পাশাপাশি ঃ

১ বৈশাখ, ৭ পড়, ৮ ললনা, ৯ দশ, ১০ মজ্জিদ, ১২ ঘটিকা, ১৪ নরক, ১৫ কঞ্জুস, ১৭ অলি, ১৮ কন্দর্প, ১৯ নখ, ২১ দরাজ।

উপর-নীচ ঃ

২ শাপ, ৩ খড়ম, ৪ গলদঘর্ম, ৫ খনা, ৬ সুদর্শন, ১১ ঘটকর্পর, ১৩ কাপালিক, ১৬ সনদ, ১৮ কটি, ২০ খরা।

পাশাপাশি ১৪ ও উপর-নীচ ১১ নং সূত্র দুটি ভুল ছিল। ঐ দুটি বাদে অন্যগুলির নির্ভুল উত্তরদাতা ঃ

অরুনাভ পাঁজা (৭ গ্রা, ১২৬৮)—ভাদুর, হুগলী। অরিন্দম দে—কলকাতা ৯। অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস—পদ্মপুকুর, তারকেশ্বর। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী—তারাবাগ, বর্ধমান। কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী (গ্রা, ১৮২১)—গ্যাংটক। কৃষ্ণা, সরেন ও সুতপা ভট্টাচার্য—খন্যান, হুগলী। ঝুমা বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রা, ৮৩৮) কলকাতা ৯। তুষার ও তরুনকান্তি বারিক—কলকাতা ২৩। নীলাঞ্জন দাস (গ্রা, ১২১৬)—কলকাতা ২৫। পিউ, পাপু, পুনম, শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবনী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়—সগড়াই, বর্ধমান। প্রসূন চট্টোপাধ্যায়—দুর্গাপুর ৪। বাসুদেব ঝা (২৫৯৯)—দেওঘর। বিকাশ, তপন, কৃষ্ণা, স্বপন, গৌতম, কাবেরী, অনুপম মোদক—হরিপুর, বর্ধমান। রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ—আরামবাগ, হুগলী। শিবু, তুলসী, রঘু, রাজা, মন, সোনা, টুসু, শিবাশিস সেন ও শুভাশিস ঘোষ—ডি. বি সি. রোড, জলপাইগুড়ি। শাশ্বত পুরকায়স্থ—করিমগঞ্জ, কাছাড়। সোনালী ও পিয়ালী ঘোষ—ক্যানিং। সুভাষ মুখোপাধ্যায়—গোপালমাঠ, বর্ধমান। হরেকৃষ্ণ, মনোরমা, মদনমোহন, বিদ্যুৎরানী ও দীপ্তিরানী সামন্ত—বিজয়গড়, যাদবপুর। শুভ, মৌ মা—হাইলাকান্দি, কাছাড়।

পদ্মফুল

মঞ্জুদি

ফুল ভালোবাসে না এমন লোক খুবই কম আছে। তাই অনায়াসেই ধরে নিতে পারি আর পাঁচজনের মত তুমিও ফুল ভালোবাসো। আর ভালোবাসো বলেই হাতের কাজের আসরে এবার এনেছি পদ্মফুল!

কেমন করে পদ্মফুল হবে এবার শোন।

দুখানা রঙীন কাগজ নিয়ে প্রথমে রোল কর। রোল করার পর এক নম্বর চিত্রের অনুকরণে এমনভাবে কাঁচি দিয়ে আধাআধি কাট, যাতে দুটুকরো না হয়ে যায়।

এবারে দুই নম্বর চিত্রের মত, পাতার আকৃতিতে রোলটা কাট। একটু সাবধানে যাতে টেরাবাঁকা না হয়ে যায়।

করলে তো। এবারে তিন নম্বর চিত্রের দিকে তাকাও। ওখানে যেমন করে পাতাগুলোকে নিচের দিকে ভাঁজ করেছে, তোমাকেও সেইভাবে ভাঁজ করতে হবে।

ভাঁজ করে চার নম্বর চিত্রের মতই রোলটার ওপর দিক থেকে টানো।

এবারে রোলটা ঘোরাও যেন পাতাগুলো পরপর থাকে যেমন ভাবে পাঁচ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে।

ছয় নম্বর চিত্রের অনুকরণে এবারে রোলটার কেন্দ্রের দিকে চাপ দিতে হবে।

দিয়েছ? এখন ওপর দিক থেকে পাতাগুলোকে খোল। দেখবে একটা তাজা পদ্মফুল তোমার হাতে ফুটে রয়েছে।

এখন তুমি যাকে সবচেয়ে ভালোবাসো তাকেই ফুলটা উপহার দাও। দেখবে নিদারুণ খুশী হবে।

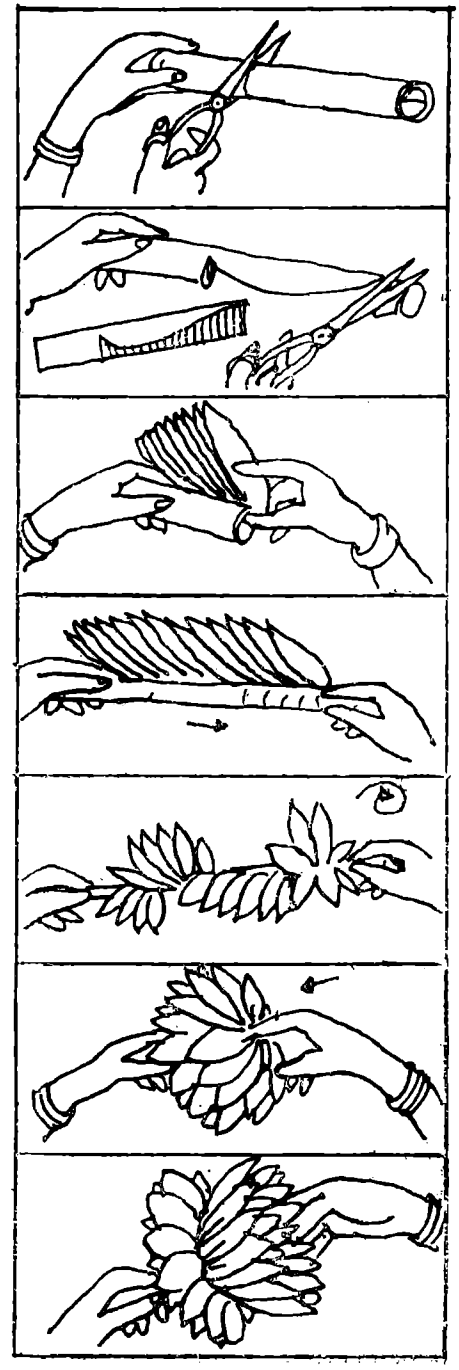

তোমাদের পাতা

ছেলেটির পরিচয়

বিমলকুমার ব্যানার্জী (গ্রা. ১৩৪২)

কি জিজ্ঞাসা করবেন ?

কথাটা সারা স্কুলেই ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে মুখে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের কানে যখন এই কথাটা প্রবেশ করলো তখন পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রশ্ন একটিই "কি জিজ্ঞাসা করবেন" মুসকিল হলো কেউই ঠিকমত উত্তরটা দিতে পারছে না। ফলে সবাই মুখ শুকনো করে ভগবানকে ডাকছে, যাতে অন্ততঃ এ যাত্রা মুখ রক্ষা হয়।

শুধু একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে বসে একটি ছেলে ক্লাসের অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছে। মুখ দেখে মনে হয় ছেলেটি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। হঠাৎ ক্লাসটা শান্ত হয়ে যায়।

কৌতূহলী হয়ে ছেলেটি মাথাটা তুলে সামনের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে আকস্মিক ক্লাস নীরব হওয়ার কারণ।

হ্যাঁ যাকে নিয়ে সারাটা স্কুলে এমনকি তাদের ক্লাসে তুমুল আলোচনা চলছিল। তিনিই অর্থাৎ পরিদর্শক মশাই এসে ক্লাসে হাজির হয়েছেন। ছয় থেকে সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, চোখ দুটি টানাটানা, মুখশ্রী খুবই সুন্দর। পায়ের রঙ টকটকে লাল। বেশ বোঝা যায়। পরিদর্শক ভারতীয় নন।

পরিদর্শক যখন ক্লাসের ভিতরকার পরিবেশ দেখতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় ছেলেটি খাতা খুলে মনোযোগ সহকারে কি যেন করছিল। আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল। পরিদর্শক মশাইয়ের প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

ঐ সময় পাশের একটি ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলো। দাঁড়িয়ে বলল, স্যার উপেন ছবি আঁকছে।

এমনভাবে যে তার সহপাঠী বিশ্বাসঘাতকতা করবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে।

পরিদর্শক মশাই ধীর পদক্ষেপে ছেলেটির কাছে এসে বললেন—দেখি তোমার খাতাটা।

চুরি করতে গিয়ে চোর যেমন হাতেনাতে ধরা পড়ে বোকা বনে যায়, তেমনি ছেলেটি বোকা না বনলেও থতমত খেয়ে গেল।

সভয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল তার দিকে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুধু শিউরে উঠতে লাগলো। কারণ যে কাজ সে করছে তার জন্যে পরিদর্শক মশাই তাকে ক্ষমাতো করবেনই না বরং কোনদিন যাতে কোন স্কুলে না পড়তে পারে তারও ব্যবস্থা করতে পারেন।

সবাইকে 'থ' করে দিয়ে পরিদর্শক মশাই ছেলেটির পিঠ চাপড়ে বলল,—আরে এতো আমার ছবিই এঁকেছ। কিন্তু একটু ভুল করেছ রঙটা নীল হবে না লাল হবে। কেননা আমার গায়ের রঙ লাল। কৌতুক করেই কথাটা তিনি বললেন।

সবারই দেখে অল্পবিস্তর হিংসা হলো। আগে জানলে তারাও ছবি এঁকে প্রংশসা কুড়াতে পারত। এইসব আকাশ কুসুম কল্পনা যখন সকলে করছিলো, তখন পরিদর্শক ছেলেটিকে বললেন—তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বড় হলে তুমি নিশ্চিত একজন নামকরা শিল্পী হবে।

সেদিনের সেই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রটি সত্যিই একদিন নামকরা শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তার নামটা হলো শিশু শিল্পী সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

ছড়া

তাপসকুমার চিনি

ছাগল নাকি পাগল হলে
আপেল তাপেল খায় ;
আমায় এটা শুনিয়েছিল
বংশীবদন রায়।
ব্যাপারখানা ঘটেছিল
এই বাংলাদেশে
নিজের চোখেই দেখেছিলাম
বললে হেসে হেসে।

মধুর ছন্দে

মহাম্মদআবদুল্লাহ

পেত্‌নি ও মামদো—
মোটা সোঁটা গামদো,
দুজনায় লেগে যেত
ঘন ঘন দ্বন্দ্ব ॥
তাই দেখে চুন্নি
অশান্ত ঘূর্ণি
ভেউ ভেউ কাঁদতে
লাগোনিকো মন্দ ॥

ছড়া

সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বরষা এলো ভরসা এলো
ফলবে এবার ধান,
রুপোর পালিশ মাখা ইলিশ
আনরে কিনে আন।
হায় কি হলো, হায় কি হলো
এই ছিল ললাটে,
বানের জলে ভেসে গেলো
গাঁয়ের যত ভিটে।

আমার কথা

খুশীর

আমার ছবি

খবর

শোন, একটা দারুণ খুশীর খবর! তুমি যদি ছবি আঁকতে পার, তাহলে একখানা সাদা ড্রয়িং পেপারে তোমার সবচেয়ে প্রিয় ছবিখানা চাইনীজ ইঙ্কের সাহায্যে এঁকে এখনি পক্ষিরাজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। আর সেই সঙ্গে পরিস্কার করে লেখ তোমার নাম, বয়েস, তুমি কোন স্কুলে পড়, কার কাছে ছবি আঁকা শেখ, কে তোমায় বেশী উৎসাহ দেয়, কখনও কোন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছ কিনা আর বড় হয়ে তুমি কার মত হবে।

কলকাতা, তুই কোনটারে ?

তরুণকান্তি বারিক

ধুত্তোরি ছাই ; বলনারে ভাই
কলকাতা তুই কোনটারে ?
বেশতো না হয় ; দিলেম সময়
ঠিক করে নে মনটারে ।
কাঁকর মেশা চালের মুঠি ;
অনেক কালের শুকনোরুটি
কোলকাতা তুই ঐ ?
কিংবা রুটি, মাখন সাথে ;
সদাই থাকিস দুধে-ভাতে
তুই কি ধনীর সই ?
কলকাতা ভাই রাখ হেঁয়ালি ;
তবে কি তুই পাঁচমিশালী
নানান কিছুর জট ?
তাহলে শোন্ বলছি ভাই ;
ওসব কিছুর সময় নাই
পাল্টে দে তোর পট ।

বলো তো ?

নীচে তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের নামের পাশে তিনটি করে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম দেওয়া হল। ঐ সাহিত্যিকের সঠিক ছদ্মনামের উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। এতে অবশ্য তোমরা যারা সব সাহিত্যিকের ছদ্মনাম কি তা জাননা, তারা জানতে পারবে। উত্তর পত্রের ওপরে 'বলো তো ?' কথাটি লিখবে।

১। **সৈয়দ মুজতবা আলি—দৃষ্টিহীন/ওমর খৈয়াম/হাবুশর্মা।**
২। **হিমানীশ গোস্বামী—দিগ্‌দর্শক/চিরঞ্জীব/অষ্টবক্র।**
৩। **তারাপদ রায়—গ্রন্থকীট/শ্রীবাসব/ভ্রমর।**

বর্ষা আসে

অভিজিৎ নাগ (গ্রাহক নং ২৪০৮)

বর্ষা আসে বর্ষা আসে
গুরু গুরু শব্দ তুলে
বৃষ্টিতে ওই উঠল ভিজে
চমক মারে বিজলী রেখা
বাহিরেতে থাকব না ভাই
না জানি আজ সুয্যিমামা
বর্ষা আসে বর্ষা আসে
চর্তুদোলায় চড়ে
আকাশ কালো করে।
পিয়ালের বন
ওই যে ক্ষণে ক্ষণ ।
চল্ চল্ চল্ ছুটে
উঠবে কখন ফুটে।
উঠল ধরা মেতে
ভিজে হাওয়া মাতিয়ে বেড়ায় আজকে ধানের ক্ষেতে।
নামল রে ঐ বৃষ্টি ধারা
পাখিগুলি ভিজে সারা
দাঁড়ায় মাঠে জল,
বাইরে তো আজ থাকবনা ভাই
চল্ দৌড়ে চল্ চলে যাই
ঝরছে রে বাদল।

বৈশাখ মাসের 'বলো তো'-র উত্তর

১। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য।**
২। **ধনপত রায়—প্রেমচন্দ।**
৩। **অমিতাভ চৌধুরী—চাণক্য।**

নির্ভুল উত্তরদাতা ঃ

অপূর্ব, শুভেন্দু ও তপন ভট্টাচার্য, ছন্দা চক্রবর্তী, শান্তিপ্রিয় ত্রিবেদী—ঠিকানার উল্লেখ নেই। নিমাই, বিশ্বম্ভর, মানসী, মহুয়া, এইচ. ডি.—অন্ডাল বাজার, বর্ধমান। পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়—বেহালা। মদনমোহন সামন্ত (গ্রা ২৮৯৬)—বিজয়গড়, যাদবপুর। মনি, মালবিকা, মানস দত্ত—আমলাগোড়া, মেদিনীপুর। রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ—আরামবাগ, হুগলী। শম্ভুনাথ দাস, প্রসেনজিৎ চৌধুরী, কাকলী ও ইন্দ্রজিৎ দাসগুপ্ত, প্রবাল ও শৈবাল—কলকাতা ৬। সারিকা, সৌম্য, পূর্ণিমা ও শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী, শ্রাবনী ও বেলা চট্টোপাধ্যায়—শ্রীপল্লী, আসানসোল।

'অনিলকুমার করাতি কর্তৃক ৩৮বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত ও কাইন প্রিন্টিং হাউস, ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের প্রিয় লেখকদের লেখা দারুণ দারুণ কয়েকটা গল্পের বই খুব শিগগিরই আমরা তোমাদের উপহার দিচ্ছি ঃ

ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্ প্রেমেন্দ্র মিত্র

রাজা মহাশ্বেতা দেবী

এক যে ছিল পায়রা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অর্জুনের এ্যাডভেঞ্চার কবিতা সিংহ

জাদুকর বসন্তনিবাস অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

লঙ সাহেবের বাঘ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

লক্ষ্য সিংহাসন ধীরেন্দ্রলাল ধর

এছাড়াও লিখেছেন ঃ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও আরও কয়েকজন তোমাদের প্রিয় লেখক।

পক্ষিরাজ প্রকাশনী

৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৯

ফোন : ৩৪-৩১৪৬

PAKSHIRAJ Regd. No. WB/EC 165 RN. No. 32844/78 June-July '81 Rs. 1·00

শিশুদের মনভোলানো রঙিন বই

ছড়ায় ও পাতাভরা রঙিন ছবিতে শিশুদের মনভোলাবে ঃ

ছড়ার ছবি ১/ ছড়ার ছবি ২/ ছড়ার ছবি ৩/ ছড়ার ছবি ক/ ছড়ার ছবি খ/ ছড়া ছবিতে জানোয়ার / ছড়া ছবিতে পাখি / ছড়া ছবিতে পাখি ২/ ছড়া ছবিতে ফুল / ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন ।

ছড়া ও পাতাভরা রঙিন ছবিতে বর্ণ পরিচয় ঃ

ছড়া ছবিতে অ আ ক খ / ছড়া ছবিতে বর্ণ পরিচয় ।

রঙিন মজাদার ছড়ার ও পড়ার বই ঃ

সুনির্মল বসু : আনার ছড়া / সুকুমার রায় : খাপছাড়া / যোগীন্দ্র সরকার : হাসিখুশি ১ ; হাসিখুশি ২ ; হাসিরাশি ; আষাঢ়ে স্বপন / প্রেমেন্দ্র মিত্র : কুমির সাহেব / শশিভূষণ দাশগুপ্ত : শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে/উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক : মজার কবিতা/ভবানীপ্রসাদ মজুমদার : মজার ছড়া / শৈল চক্রবর্তী : ছড়ার দেশে টুকটুনি ।

রঙিন ছবিতে মহাকাব্য ঃ

ছবিতে রামায়ণ / ছবিতে মহাভারত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড / কলিকাতা ৯